উৎসর্গ

স্বর্গত পিতামহ

৺রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

॥ ভূমিকা ॥

বাউল ও বাউলগানের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করে এসেছি একান্ত শিশুকাল থেকে। মনে আছে একতারা-হাতে বিচিত্রবেশী বাউল যখন আপন ভাবে বিভোর হয়ে উদাত্তকণ্ঠে গান ধরতো, আর সেই সঙ্গে তার আলখাল্লাপরা দেহটি নৃত্যচঞ্চল হয়ে উঠতো বিশিষ্ট ভঙ্গিতে, তখন আমার কিশোর মনেও কী এক ভাবান্তর উপস্থিত হতো। বন-বিষ্ণুপুরের রুক্ষ রাঙামাটির দিগন্তস্পর্শী একটানা আঁকাবাঁকা দীর্ঘ পথে কতবার দেখেছি বাউলকে চলে যেতে একতারা হাতে, একাকী। আর কিশোর মনে বার বার এ প্রশ্ন জেগেছে, কোথায় চলেছে ও, কেমন ধারা ওর জীবন!

তারপর কতদিন কেটে গেছে। বড় হয়ে যখন রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার পরম সৌভাগ্যলাভ ঘটলো, তখন বিস্মিত হলাম দেখে যে, কবিগুরু আশ্চর্য উৎসাহ প্রকাশ করেছেন এই বাউলদের সম্বন্ধে। প্রবন্ধে, নাটকে, কাব্যে, সর্বোপরি গানে বাউলের প্রতি তাঁর চিত্তের প্রবল আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। কৌতূহল জাগলো, কী আছে ওই গানে যা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিকে এমনভাবে টান দিয়েছে? অশিক্ষিত, অজ্ঞাত অখ্যাত বাউলের গ্রাম্য রচনায় এমন কী বস্তু রয়েছে, যা মুহূর্তে গুণীর চোখে ধরা পড়ে গেলো, এমন প্রশংসামুখর করে তুললো তাঁকে।

এ গ্রন্থ আমার মনের সেই কৌতূহল ও প্রশ্নেরই ফল। দীর্ঘ কয়েক বৎসর (১৯৪৯—১৯৫৭) ধরে বাঙলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বহু গান সংগ্রহ করেছি। বিশেষ করে আমার জন্মভূমি বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর এবং মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বীরভূমের গায়ক বাউলের কণ্ঠে শুনতে পেয়েছি অনেক গান। পৌষ সংক্রান্তিতে কেন্দুলি মেলায় বাউলের সঙ্গে দেখা হয়েছে ; পরিচয় ঘটেছে। বিশেষ বাধায় পূর্ববঙ্গে গিয়ে গান সংগ্রহের সৌভাগ্য যদিও ঘটেনি, তবু বহু শুভার্থীর মাধ্যমে ওখানকার গানও আমার হাতে এসেছে। এ ছাড়া

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে গুরুদেবের নিজস্ব বাউল সঙ্গীত সংগ্রহ সহজে ব্যবহার করতে পেরেছি রবীন্দ্র-ভবনের সৌজন্যে। এ পর্যন্ত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গানগুলিও সাহায্য করেছে যথেষ্ট।

বাউলগানের মণিমন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করেছি। আমার এ যাত্রাপথে দীপস্বরূপ হয়েছে যাঁদের বাণী, তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। বিশেষ করে প্রণতি জানাই কবিগুরুকে। তাঁর রচনা আমার পথের প্রদর্শক, আমার প্রয়াসের প্রেরণা।

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-ভবনে গুরুদেবের যে বাউলসংগীত-সংগ্রহ আছে, তা দেখবার ও ব্যবহার করবার সুযোগ দিয়েছিলেন তৎকালীন রবীন্দ্র-ভবনের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। পরে শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়ও এ সুযোগ দিয়ে সাহায্য করেন। এঁদের দুজনকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রত্যক্ষভাবে আলাপের সুযোগ না পেলেও যাঁদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ লাভে অনুপ্রাণিত ও উপকৃত হয়েছি, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ। কবিরাজ মহাশয়কে আমার প্রণতি জানাই।

বাঙলার নিজস্ব সম্পদ বাউলগান ভাবে ও সুরে সাহিত্য জগতের শিখরলোকের সামগ্রী। তার স্বরূপাস্বাদন উদ্দেশ্যেই এ আলোচনা। মূলত বাউলের দার্শনিক তত্ত্ব ও কাব্যিক বৈশিষ্ট্য আমার উপজীব্য। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা-মূলক আলোচনা, অন্য সাধন-ধারার সঙ্গে পার্থক্য-নির্ণয় ও সম্বন্ধ বিচার এবং বাঙলা সাহিত্যে এর স্থান-নির্দেশ এসেছে। কিন্তু এ সমস্ত আলোচনা একটি উদ্দেশ্যের দ্বারা বিধৃত। আমার একমাত্র লক্ষ্য বাউলমনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, পরিচিত করানো। বিখ্যাত ফরাসী ভাবুক জুবেয়ার বলেছিলেন, 'লেখকের মনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়াই সমালোচনার সৌন্দর্য ; লেখার বিশুদ্ধ নিয়ম রক্ষা হইয়াছে কিনা তাহার খবরদারি করা তাহার ব্যবসাগত কাজ বটে, কিন্তু সেইটেই

সবচেয়ে কম দরকারি।' সমালোচনা-কালে এই সত্যটি স্মরণে রাখার চেষ্টা করেছি।

বাউলের গান গ্রাম্য গান, সরলভাষায় রচিত, সহজ তার ভঙ্গি। তার রূপ মন টলায় না, কিন্তু প্রাণ গলায়। তার সুর উদাসী সুর। হিসেবকষা সংসারী মনকেও সে ক্ষণিকের জন্য উদাস করে তোলে। পল্লীগ্রামের ধূ ধূ করা দিগন্তবিস্তৃত ফাঁকা মাঠ, আর উদার বিস্তীর্ণ মেঘমুক্ত আকাশের সঙ্গে সে সুরের মিল আছে। বাউলের গান যেন ঐ রুক্ষ মাটির গান, মহা-আকাশের সুরে রচা। সেই গানের দীপ জ্বালিয়ে সাধক বাউল চলেছে তার বহুবাঞ্ছিত তীর্থপথে, মনের মানুষের আশায়—অধরার অন্বেষণে।

অসীমাভিসারী সেই মনের পরিচয় নেবার ও দেবার প্রয়াস পেলাম। আমার উপলব্ধিকে ব্যক্ত ও উপস্থাপিত করায় কতখানি সার্থক হয়েছি কি জানি, কিন্তু বাউলগানের আলোকে বাউলমনের পরিচয় লাভে ধন্য হয়েছি। গানসংগ্রহ, উপাদান আহরণ এবং গ্রন্থ রচনার সকল শ্রম সহজে ভুলেছি এই কারণে। সহজমনের স্পর্শমণির স্পর্শে ক্ষণিকের জন্যও আপন চিত্তকে আনন্দের আভাস-স্পন্দিত করে তুলতে পেরেছি, এই আমার পরম লাভ।

পূজনীয় শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু মহাশয় আমার এ গ্রন্থের জন্য বিশেষভাবে একটি বাউলের ছবি এঁকে দিয়েছেন। তাঁর স্নেহের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। বাউলের দ্বিতীয় রেখাচিত্রটি আমার পূজনীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা। প্রচ্ছদপটটি এঁকেছেন আমার ভ্রাতৃকল্প শিল্পীবন্ধু শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয় গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ সূচীপত্র ॥

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

॥ পরিশিষ্ট ॥

'ওরা অন্ত্যজ ওরা মন্ত্রবর্জিত
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে
নক্ষত্রখচিত আকাশে
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে
দোসর জনার মিলন বিরহের
গহন বেদনায়।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।'

বাঙলার বাউল

কাব্য ও দর্শন

শিল্পী ঃ শ্রীনন্দলাল বসু

পূর্বাভাষ

মনের গীতিমুখর প্রকাশ কর্মক্লান্ত চিত্তে অনন্তের আবেশ-মধুর আনন্দের উদ্বোধন করে, তাই কর্মের জগতে গানের আদর। কর্মের জগৎ; মানবজীবন সততই কর্মচঞ্চল। কর্মের প্রতি মানবচিত্তের আকর্ষণ প্রবল এবং প্রচুর, তথাপি কর্মে মানুষের মন টানলেও গানে তার প্রাণ টানে। বাহিরের জগতে কর্মের অখণ্ড প্রতাপ হলেও অন্তরের সিংহাসনে গান একাধীশ্বর। গীতিকার সর্বমনের অতি প্রিয়।

সঙ্গীত

প্রতিদেশেই এই গানে সাহিত্যের সূচনা। শুধু তাই নয়, গান সকল দেশের সকল জাতির জীবনে প্রধান অঙ্গরূপে বিরাজমান। বিভিন্ন দেশে বিচিত্ররূপে প্রবহমান সঙ্গীতরসধারা মানবচিত্তকে অভিসিঞ্চিত ক'রে নন্দিত ক'রে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে এই সঙ্গীতে দেশের আন্তর ইতিহাস, দেশের মানস ঐতিহ্যের প্রকৃষ্ট পরিচিতি। গানেই তার প্রাণের প্রকাশ। তাই দেশের প্রাণের প্রকৃত পরিচয় পেতে হ'লে এদিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়। সে পরিচয় রাজরাজড়ার কাহিনী ও যুদ্ধবিগ্রহের বিবৃতিভরা তথাকথিত ইতিহাসে নেই, সেকথা যেন আমরা জেনেও জানি না।

আমাদের বাঙলাদেশেরও আকাশে কোন স্মরণাতীত কাল থেকে গানের সুর ধ্বনিত হয়েছে। প্রাচীনতম যুগ থেকে বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে গান জেগেছে। কীর্তনগান, ভাটিয়ালগান, আগমনী বিজয়ার গান, এমনিতর ছোট বড় কতো যে গানের সৃষ্টি হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সুগভীর ভাবসম্পদে ও অভিনব সুরস্পন্দনে যে গান সারা বাঙলায় অতিপ্রসিদ্ধি লাভ ক'রে বাঙালীর মানসলোকে শ্রেষ্ঠ আসনটি অধিকার করেছে, তা হ'ল বাঙলার বাউলগান। খালবিলে

ভরা নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের সুজল সুফল শ্যামল অঞ্চলে যেমন, শুষ্ক কঠিন রুক্ষ রাঙ্গামাটির দেশ পশ্চিমবঙ্গের উদার বিস্তীর্ণ সীমাহীন প্রান্তরেও তেমনি বাউলগানের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে সমানভাবে। যাযাবর বাউল কখনও একক, কখনও বা দলবদ্ধ হয়ে দেশে দেশে ঘুরেছে বিচিত্র বিশিষ্ট বেশে, একতারার সাহচর্যে তার উদাত্ত কণ্ঠস্বরে উদ্গীত উদাসী সুর জনগণের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে। কি বাণীর গৌরবে, কি সুরের মহিমায় বাউলগান সঙ্গীতজগতে শিখরলোকবর্তী। রবীন্দ্রনাথ এর আলোচনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, এখানে তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

বাউলের শ্রেষ্ঠতা

'এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্য-রচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।'

মৌনরব ভাবকে বাউল প্রকাশ করেছে সরলতম ভাষায়। তার বাণী যেমন সরল, সুরও তেমনি সহজ। শান্ত সুন্দর ভাব-সম্পদের এই সুরময় অভিব্যক্তি যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে আনন্দরস পরিবেশন ক'রে এসেছে। অথচ এর দৈর্ঘ্য প্রস্থে বিস্তার নেই, এর রূপ অতি সংক্ষিপ্ত। তবু আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও তার মূল্য ক্ষুদ্র নয়। কতো কবির আবির্ভাব ও বিলয় ঘটল, কতো কাব্য সৃষ্ট হয়ে বিস্মৃতির অন্ধকারে আশ্রয় নিল, কিন্তু বাউল তাদের ফাঁক দিয়ে আপন অস্তিত্বের ধারা বজায় রেখেছে, আজও এ লুপ্ত হয়ে যায়নি। মানুষের জীবনে যা সহজ, যা সত্য তারই প্রকাশ বাউলের গানে। তার ঝঙ্কার আপন স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়ে ব্যক্তিকে টেনে নিয়ে যায় শান্তি ও আনন্দের রাজ্যে। তাই মানুষ তাকে স্থায়িত্ব না দিয়ে পারেনি। প্রতিদিনের সংসারে স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় সত্যের অনুভূতি লুপ্ত হয়। বাউলগান দেয় সেই সত্যের স্পর্শ।

গানের সৌন্দর্য

প্রাত্যহিক উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে চিত্তে স্থিতির সুখ, শান্তি-সুখ এনে দিয়ে বুদ্ধির জটিলতা থেকে রক্ষা করে। কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যেও মানুষ সুন্দরের সন্ধান পায়, শান্তিতে অবগাহন করে। এ গান খণ্ড জীবনের গ্লানি দূর ক'রে প্রাণে প্রসন্নতা আনে, সংসারের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়। রুদ্ধ ঘরে 'আপন-বাহির' জগতের আলোহাওয়া নিয়ে আসে।[১] আক্ষেপ-বিক্ষেপভরা চিত্তে অন্তর্নিহিত অমৃত-আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বোধিত ক'রে তোলে। উদ্দাম প্রবৃত্তিতাড়িত, সংসারচক্রে আবর্তিত মানুষ এ গানে শান্তির সন্ধান পায়, মনে প্রশান্তির আস্বাদ লাভ করে। এ হ'ল শান্তি ও আনন্দের তীর্থক্ষেত্র।

সাধারণ মানুষের কাছে অবশ্য সংসারটাই বড়। বৃহত্তর বিশ্বের অস্তিত্বের ধার সে ধারে না, তা নিয়ে তার দায় নেই। সে জানে কর্মকে, স্বার্থিক প্রয়োজনকে। তাই সে অহঙ্কারের প্রেরণায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে বল্‌গাহারা অশ্বের মতো। কিন্তু এই অতিরিক্ত কর্মপ্রিয়তার একটা প্রতিক্রিয়া আছে। মানুষের অন্তর তলে তলে যে শ্রান্ত, অবসন্ন হয়ে ওঠে, সে খবর কাজের মানুষ বাইরে থেকে নিজেও জানতে পারে না। কিন্তু কর্মময় সংসারের রুদ্ধদ্বার গৃহের বদ্ধ আবহাওয়ায় সে ক্রমশ হাঁপিয়ে ওঠে। মনের চাওয়াকে ছাড়িয়ে তখন বড় হয়ে ওঠে প্রাণের চাওয়া। বাউলগান তার সেই চাওয়াকে পূর্ণ ক'রে অন্তরে মাধুরী সঞ্চার করে। সংসারে কাজের ভূতে-পাওয়া মানুষ ; এ গান সেই ভূতঝাড়া মন্ত্র পড়ে। ভূতটা পালায়, যদিও মন্ত্রোচ্চারণ স্তব্ধ হলেই আবার সে ফিরে আসে। তথাপি ক্ষণিক হলেও এ সংসারে সেই শান্তির সুরের মূল্য,

[১] আপনার রুদ্ধদ্বার মাঝে
অন্ধকার নিয়ত বিরাজে
আপন বাহিরে মেলো চোখ
সেইখানে অনন্ত আলোক

—স্ফুলিঙ্গ, রবীন্দ্রনাথ

আনন্দের দান কম নয়। হৃদয়ের অন্ধকারের মধ্যে বাউল গান একটি সুরের দীপ জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। সংসারীর অন্তরে তার আলো ক্ষণিকের হলেও অন্ধকারের রাজ্যে আলোর ক্ষণিক উপস্থিতিও অমূল্য। জগতে তার তুলনা নেই। এখানেই বাউলগানের গৌরব, এখানেই তার বিশিষ্টতা।

সাধারণ লোকসঙ্গীত থেকে বাউলের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠতা হ'ল এইখানে। সাধারণ লোকসঙ্গীত ও বাউলসঙ্গীত উভয়ই সঙ্গীত হলেও এই সঙ্গীতের মধ্যে গুণগত ভেদ আছে।[১] বাউলমন ব্রহ্ম-স্বাভাবিক মন, সেই মন স্বতই গীতিমুখর। কর্মের আকর্ষণ না থাকায় আনন্দিত এই মনের প্রকাশ হয় গানে। তাই কর্মচঞ্চল জীবনের অন্তিমে আনন্দের আভাস-স্পন্দিত মন আপনাকে গানে গানে প্রকাশ ক'রে সকল মনের মানুষ হয়, আত্মার সর্বশক্তিমত্তার পরিচয় দেয়, মায়িক 'আমির' কর্মকুশলতা প্রদর্শনে বীতস্পৃহ হয়। বাউলগান কর্মভারহীন, আত্মসংস্থিত মনের গান, জীবনমুক্তের গান।

কিন্তু কর্মভারাক্রান্ত, কর্মক্লান্ত ব্যক্তিজীবনেও কর্মের ক্ষণিক বিরামে গান জাগে। এই গানও গান হলেও ইচ্ছা-নির্বাপিত মনের গানের মতো অসীমের আবেশঝঙ্কৃত নয়। তাই এই সাধারণ লোকসঙ্গীতের

বিশিষ্টতা

ব্যাপকতা সার্বত্রিক নয়, তাৎকালিক, সর্বভাবাত্মক নয়, বৈশেষিক। মৈমনসিংহ গীতিকা প্রভৃতির সঙ্গে এখানেই বাউলের প্রভেদ। সাধারণ লোকসঙ্গীতে স্থিতির শান্ত সুষমা নেই, গতির আবেগমুখর চাঞ্চল্য আছে। বাউলগান অচঞ্চল, অপ্রমত্ত, সহজ মনের গান। তার সুর সহজ সুর। তাই ব্যক্তিনির্বিশেষে প্রতিপ্রাণে তার সঞ্চরণ। লোকসঙ্গীতে বুদ্ধি বিষয়ের প্রকাশ, সর্বসংসার-ভাবময় জ্ঞানবিষয়ের প্রকাশ নয়, তাই লোকসঙ্গীত বৈশেষিক, বাউলসঙ্গীত সার্বত্রিক। বুদ্ধিবিশেষ-নিরূপিত

১ দ্রষ্টব্য 'বাঙলা সাহিত্যে বাউলের স্থান' পরিচ্ছেদ

বৈশেষিক বিষয়ের প্রকাশ লোকসঙ্গীতে, জ্ঞানময়, সর্বসংসারবিষয়ের প্রকাশ বাউল সঙ্গীতে।

নানাকারণে এগুলি আজ দুষ্প্রাপ্য। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গায়ক বৈরাগীর মাধ্যমে এ গান আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। তাই পথিক ভিখারীর মুখে অথবা ক্বচিৎ কখনও মেলায় সমবেত বাউল ফকিরের কণ্ঠে এর সুর শুনতে পাওয়া যায়। সেই বিভিন্ন উৎস থেকে বহু পরিশ্রমে যে গানগুলি সংগৃহীত সেগুলি দেশের হারামণি। এই হারামণির স্বরূপ বিশ্লেষণ ও সৌন্দর্যসম্ভোগই আমাদের উদ্দেশ্য।

হারামণি

গান প্রাণের অভিব্যক্তি, তার আবেদনও প্রাণে। সে আনন্দের প্রকাশ, তার পরিণতিও আনন্দে। তাকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে, তার সৌন্দর্য ও মাধুর্যের বিশ্লেষণ করতে যাওয়ার মতো অরসিকতা হয়তো আর নেই। তাই সঙ্গীতের সমালোচনা করতে গিয়ে স্বভাবতই বাউল কবির ব্যঙ্গোক্তিটি মনে পড়ে—

গানের সমালোচনা

'ওরে ফুলের বনে কে পশেছে
সোনার জহুরী
নিকষে কষয়ে কমল
আ মরি মরি।'

তবে সমালোচনারও রীতিভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রকৃত সমালোচনা হ'ল ভক্তি মিশ্রিত ব্যাখ্যা। রচনার ধারাটি অনুসরণ ক'রে তার স্বরূপ উপলব্ধি এবং প্রকাশই সমালোচকের কাজ। আমরাও এখানে সেই কাব্যানুগ ব্যাখ্যা-রীতির অনুবর্তনের প্রয়াস পাব।

॥ ২ ॥

বাউলগানের আলোচনার পূর্বে 'বাউল' সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বাউল নামের তাৎপর্য কী, বাউল সম্প্রদায় কী ভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্য কী, এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা না করলে মূল বক্তব্যে আসা যাবে না।

আমাদের মনে হয়, বাউল-সম্প্রদায় সৃষ্টির মূলে বাউলদের সম্প্রদায়ভুক্তির কারণ হিসেবে রয়েছে তাদের বিশিষ্ট জীবনধারা। ধরণধারণ, আচারব্যবহার, এক কথায় সমগ্র জীবনচর্যা তাদের সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন, পৃথক ক'রে এমনই এক অসাধারণত্ব-মণ্ডিত করেছে, যার ফলে একটি স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে সহজেই। জগতে প্রকাশভঙ্গিমাই তাদের বিশিষ্ট ক'রে বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত করেছে। 'বাউল' নামকরণেই তার পরিচয় মেলে।

'বাউল' শব্দের তাৎপর্য আলোচনা করতে গেলে দেখি সংস্কৃত বাতুল শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। অর্থাৎ বাউল অর্থ পাগল।

বাতুল : বাউল

এখানে দুটি প্রশ্ন জাগে। প্রথমত বাতুল বা পাগল আখ্যা দানের কারণ কী এবং দ্বিতীয়ত এদের জীবনচর্যার বিশিষ্ট প্রকাশে বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্তিরই বা তাৎপর্য কোথায়।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, বাউল শব্দটি ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত হয়নি, হয়েছে একটি গোষ্ঠীর প্রতি।

'বাতুল এই বিশেষণটি যাদের প্রতি প্রযুক্ত, গানের মাধ্যমে তাদের প্রকৃতির স্বরূপ আর বৈশিষ্ট্য আলোচনা ক'রে এই প্রতিপন্ন হয় যে তারা সত্যদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তি, গুণময়মায়া-বিজ্ঞানোত্তর পর্বে উন্নীত উদাসীন পুরুষ। সুতরাং এমন একটি জীবন্মুক্ত পুরুষের দলের প্রতি 'বাতুল' শব্দের প্রয়োগে বিস্ময়ের অবকাশ আছে সেকথা

বলাই বাহুল্য। এই অদ্ভুত নামাঙ্কন এবং এদের সম্প্রদায়ভুক্তির মর্মোদ্ঘাটনই আমাদের উদ্দেশ্য।

জাগতিক মানুষ অহঙ্কারনিষ্ঠ। তার দৃষ্টি তাই একদেশমুখী। সে দেশ অস্বরূপের দেশ, রূপের দেশ। সত্যদৃষ্টিহীন সাধারণ মানুষ রূপে আসক্ত, সে রূপাসক্তি তার চিত্তে ইচ্ছার সৃষ্টি করে। ইচ্ছা দেয় কর্মের প্রেরণা। এটিই মায়াবদ্ধ অহঙ্কারীর ধর্ম। ব্যক্তি অহঙ্কারের ধ্বজাধারী। 'আমার পুত্র, আমার গৃহ, আমার সম্পদ, আমার ঐশ্বর্য' এমনিভাবে সে প্রচার করে আপন আমিকে।

নামাঙ্কনের কারণ

আপন কামনার পূর্ণতায়, বাসনার সিদ্ধিতেই ব্যক্তিজীবনের পূর্ণতা। তাতেই তার ব্যক্তিত্ব। ইচ্ছার প্রাবল্য এবং তজ্জনিত আত্যন্তিক কর্মপ্রীতি ব্যক্তির ধর্ম। কর্মকে সে আপন সত্তার থেকে পৃথক ক'রে দেখে না, পরন্তু তাতেই আমিত্ব আরোপ ক'রে সেইটাকেই স্বরূপ জ্ঞান করে।

অন্যদিকে এই মনোভঙ্গীর বিরুদ্ধেই বাউলের প্রকাশ। ব্যক্তির জন্ম হলেই কর্মের আবশ্যক হয়। দেহীর জীবনের সঙ্গে কর্মডোর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যতদিন দেহ কর্মও ততদিন। মায়ার বিনাশে কর্মের ধ্বংস। সুতরাং এ কর্মডোর ছিন্ন করার উপায় নেই।[১] সত্যদ্রষ্টা জীবন্মুক্ত বাউলও কর্মকে অস্বীকার করেনি, কিন্তু সে অস্বীকার করেছে বাসনাকে, ইচ্ছাকে। বাউলমতে কর্মে প্রবৃত্তি থাকুক, শুধু কর্মের প্রতি মনোভাবের ভ্রান্তি দূর হোক। জীবনে কর্মের স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে সে একথাই বলে যে জীবনের সঙ্গে তার সম্বন্ধটি সহজ হওয়া প্রয়োজন, কোনো লিপ্ততা, কোনো

১ ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ।

—তৃতীয় অধ্যায়, গীতা

আসক্তি যেন না থাকে। অপরিহার্যকে গ্রহণ করতেই হবে, কিন্তু নিবিড়ভাবে নয়। কর্মটাই 'আমি' নয়। তাই নিজেকে অসম্পৃক্ত, নির্লিপ্ত রাখাই বাঞ্ছনীয়। জীবনের কিছুই স্থায়ী নয়, সবই ক্ষয়িষ্ণু, পলাতকবৃত্তি। এটিই জীবন সম্বন্ধে চরম বাস্তব সত্য। তাই এখানে স্থায়িত্বের ইচ্ছা বিড়ম্বনা মাত্র। বস্তুকে, রূপকে ধরতে হবেই, কিন্তু বস্তুই আসল নয়, রূপই স্বরূপ নয়, এই চেতনাকে জাগরূক রাখা ভালো।

মোহমুক্ত বাউল

'যারা আসে যায়, হাসে আর চায়
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়
নেচে ছুটে ধায় কথা না শুধায়
ফুটে আর টুটে পলকে—'

সেই ক্ষণিকের অস্তিত্বে নিরাসক্ত ভোগেই আনন্দ। বস্তুকে আঁকড়ে ধরার প্রয়াসেই বন্ধন, তাই দুঃখের কারণ। কর্মের ক্ষেত্রেও 'অহং কর্তা' বোধ যতো দুঃখের মূল। 'আমি কর্তা নই', এই বোধেই ব্যক্তি জীবনমুক্ত।[১] এই হ'ল বাউলের মত।

বাউল সেই জীবনমুক্তের দল। এদের 'বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা'। অন্তরলোকের আগল খোলে পাগল, বহির্বিশ্ব সেখানে বর্ণহীন, আকর্ষণহীন। সেজন্যে রূপের নেশা আর জাগে না, কাজের নেশা লাগে না। কাজ-খোয়ানো সুরে এদের পেয়ে বসে।

তাই 'কাজে হত, কর্মে রত' যারা, যারা কর্ম ভিন্ন আপন অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে সমর্থ নয়, রূপের কদর করতে গিয়ে যারা স্বরূপের আদর ভোলে, তারা এ হেন সৃষ্টিছাড়া অসাবধানী আচার দেখে বিস্মিত হয়। এই সত্যদৃষ্টি, মোহযুক্ত সহজপুরুষদের

১ জীব যখন বলে, আমি কর্তা নই, তুমি কর্তা, তখনই জীবের মুক্তি। —শ্রীরামকৃষ্ণ

জীবনচর্যা, ভাবধারা, ধরণধারণ, এদের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গিমা সাধারণ ব্যক্তির চোখে বিসদৃশ অসঙ্গত অর্থহীন বলে প্রতীয়মান হয়। তাই জাগতিক দৃষ্টিতে এরা পাগল বা বাতুল বলেই প্রতিপন্ন।

পাগল আখ্যা

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে বাউলগান ব্যক্তির নিকটে অপ্রিয়। বস্তুত সংসারী ব্যক্তির গান শ্রবণে অপ্রীতি নেই। বরং সে গান ভালোই লাগে। কিন্তু ইচ্ছা-কাতর ব্যক্তির পক্ষে সে গানের নির্দেশ মেনে চলা কঠিন। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃততর আলোচনায় পরে আসছি, উপস্থিত শুধু এটুকু বলি যে ব্যক্তির কাছে অসুন্দর না হলেও কর্মের জগতে গানের সহজ জীবন-নীতিটা মনের মতো নয়। তাই এ গানকে জীবনে স্বীকার ক'রে চর্যায় সক্রিয় করা ব্যক্তির পক্ষে যেমন অসম্ভব, অন্তরে অস্বীকার করাও তেমনি সম্ভাব্যের সীমার অতীত। এ গান ব্যক্তির কাছে মনের মতো নয়, কিন্তু প্রাণের মতো। এই কারণে বাউলদের অস্বীকার না ক'রে 'বাতুল' বলে অহঙ্কারের প্রচার ক'রেই ব্যক্তি তৃপ্তি লাভ করেছে। কর্মের জগতে কর্মগৌরববিমুখ আত্মপ্রচারী মন 'বাতুল' বলে পরিচিত। জগতের কাছে গানের উদ্গাতারা তাই বাতুল। এ রকম বাতুলের দৃষ্টান্ত ব্যক্তিজগতে মাঝে মাঝে দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথের ধনঞ্জয় বৈরাগীও পাগল না হয়েও পাগল। সে যখন গায়—

ব্যক্তির নিকট বাউলগান আনন্দের

'রইলো বলে রাখলে কারে
হুকুম তোমার ফলবে কবে
টানাটানি টিকবে না ভাই
রবার যেটা সেটাই রবে।
ভাবছো হবে তুমি যা চাও
জগৎটাকে তুমিই নাচাও
দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে
হয়না যেটা সেটাও হবে।'

ধনঞ্জয় বৈরাগী

কিংবা 'মুক্তধারা'র বাউল যখন বলে—

'ও তো আর ফিরবে নারে ফিরবে নারে ফিরবে নারে
ঝড়ের মুখে ভাসলো তরী
কূলে ভিড়বে না আর ভিড়বে নারে।
ছড়িয়ে গেছে সুতো ছিঁড়ে
তাই খুঁটে আজ মরবো কিরে
এখন ভাঙ্গা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি
বেড়া ঘিরবো না আর ঘিরবো নারে।
ঘাটের রশি গেছে কেটে
কাঁদবো কি তাই বক্ষ ফেটে
এখন পালের রশি ধরবো কসি
এ রশি ছিঁড়বো না আর ছিঁড়বো নারে।'

তখন সংসারী তাকে পাগল ভাবে, এ গানের তাৎপর্য তার সংসার জীবনে অর্থহীন। ধনঞ্জয়ের—

'না হয় গেলো সবই ভেসে
রইবে তো সেই সর্বনেশে
যে লাভ সকল ক্ষতির শেষে
সে লাভ কেবল বাড়বে।'

এই উক্তিই তাদের কাছে সর্বনেশে বলে মনে হয়। বক্তা তাই সৃষ্টিছাড়া পাগল।

বাতপ্রধান বাতুল' নামে এই অভিহিতি বাউলকে একটি গোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। সম্প্রদায়টি যে এইভাবেই গড়ে উঠেছে, তা বাউলগানের এই উদ্ধৃতাংশটুকু থেকে বেশ উপলব্ধি করা যায়—

'বুলুক[১] সে বুলুক বুলুক
যার মনে যা লয় গো
আপনা পথের পথিক আমি
কার বা করি ভয় গো।'

---

[১] বলুক

জগতের সমালোচনা ও বিদ্রূপকে অগ্রাহ্য ক'রে, উপহাসকে উপেক্ষা ক'রে এইভাবে জীবনমুক্তের দলটি পরিণত হয়েছে যাযাবর গায়কদলে। ভ্রমণশীল বাউল শুধু আনন্দে গান গেয়ে ফিরেছে, এই গানই তার পূজা। সে বলেছে—

সম্প্রদায় সৃষ্টি

'আমার পূজা গানে গানে চলছে তাই।'

এ গান সুদূর-পিয়াসী প্রবাসী পথিকের গান। একতারা তাই এর সহচর। এ গানের খেয়া বেয়ে বাউল চলেছে কালাতীত, রূপাতীত অরূপের মন্দিরে, তার বহুবাঞ্ছিত তীর্থক্ষেত্রে, অধরার অন্বেষণে। এই তীর্থযাত্রীর দলই বাউল সম্প্রদায়।

'বাউল সম্প্রদায়' কথার প্রকৃত অর্থটি সুস্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। এর অর্থ এই নয় যে জীবনমুক্তেরা দলবদ্ধ হয়ে একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে, বস্তুত গোষ্ঠীসৃষ্টিতে তারা একান্তই নিষ্ক্রিয়। প্রয়োজনবোধে তারা সম্প্রদায় সৃষ্টি করেনি। পরন্তু সংসারী ব্যক্তির দ্বারা বাইরে থেকে বাউল নামটি আরোপিত হওয়ায় গৌণভাবে সম্প্রদায়ের ভাব জন্মলাভ করেছে। অর্থাৎ 'বাউল সম্প্রদায়' নামটি গোষ্ঠীভুক্তের প্রত্যক্ষ সৃষ্টি নয়, গোষ্ঠী-বহির্ভূতের পরোক্ষ আরোপণ।

প্রকৃত অর্থ

কেউ কেউ বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের একটা যোগ কল্পনা ক'রে বাউলও তন্ত্রসাধক এই মত পোষণ করেন। আমাদের মনে হয় এ ধারণা ভ্রান্তিমূলক, এ অনুমানের পশ্চাতে কোনো যুক্তি নেই। কারণ তন্ত্র ও বাউল উভয়ের ধর্ম পৃথক, স্বরূপ স্বতন্ত্র। উভয়কে সমগোত্রীয় ভাবা যায় না। তন্ত্র আলোচনা করলে দেখি যে ক্রিয়াবিশেষের বিশিষ্ট অনুষ্ঠানের দ্বারা বিশেষ ফললাভ ঘটানোই তার উদ্দেশ্য। এটিই এ সাধনার মূলকথা। কর্মদ্বারা ফলপ্রাপ্তিতে তান্ত্রিক প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তির পশ্চাতে আছে অহঙ্কার। বস্তুত সংসারে ফললাভের বাসনার বর্তমানতা

অহঙ্কারের বিদ্যমানতাকেই ব্যঞ্জিত করে।[১] অহঙ্কার থাকলেই প্রয়োজনবোধ থাকে. অভাব অনুভূত হয়। সে অভাব পূর্তির জন্য ফলাকাঙ্ক্ষাময় কর্মলিপ্ততা আসে। কিন্তু জ্ঞানের উদয়ে দেহ ও কর্ম প্রভৃতি দেহধর্মের অসারত্ব উপলব্ধিতে কর্মলিপ্ততা আসে না। কর্মজ আমিই আমি নয়, এ বোধ জাগ্রত হওয়ায় ফলাকাঙ্ক্ষাও জাগে না। তখনকার জীবনে কর্মটা—

তন্ত্র ও বাউল

'কেবল অলস মেঘ ব্যর্থ ছায়া ভাসানের খেলা
খেলাইছে এ বেলা ও বেলা।'

এই জাতীয়। তান্ত্রিকের মুক্তিসাধনা কিন্তু কর্মভিত্তিক, আচারনিষ্ঠ। তার বিশ্বাস আচারআচরণ ক্রিয়াকাণ্ড তন্ত্রমন্ত্রই আত্মলাভের সহায়ক।

অপরপক্ষে বাউল কর্মকাণ্ডের গুরুত্বকে এভাবে স্বীকৃতি দেয় না। সে জানে, মুক্তি জীবের অহঙ্কার-ভিত্তিক প্রয়াস-সাপেক্ষ নয়। তাই অনাসক্ত কর্মকথাই বাউলধর্মের সারকথা। এখানেই গীতা উপনিষদের সঙ্গে সে অভিন্নমত। কর্মবিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মলাভ ঘটে, একথায় বাউল বিশ্বাসী নয়। তার পথ সহজ সাধনার[২] পথ। তার কর্ম ফলাসক্তিহীন সহজ কর্ম, সে কর্মপথ সরল।[৩] এখানে তন্ত্রের সঙ্গে বাউলের বিরাট ব্যবধান। তাই বাউল

১ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ – ৪৯। দ্বিতীয় অধ্যায়, গীতা

২ মুক্তি এই সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে
নহে কৃচ্ছ্র সাধনের ক্লিষ্টকৃশ বঞ্চিত প্রাণের
আত্মঅস্বীকারে—

—প্রান্তিক, রবীন্দ্রনাথ

৩ জীবন লয়ে যতন করি
যদি সরল বাঁশি গড়ি
আপন সুরে দিবে ভরি
সকল ছিদ্র তার

—গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ

তন্ত্রসাধক, এ মত স্বীকার করার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই। বাউলের সঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রসাধনার কোনো সংযোগ আছে, এ ধারণা অমূলক। 'বাউলগানের দর্শন' পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে অসাম্যই 'বাউল' নামকরণের মূলে অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে বর্তমান। তন্ত্রে ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাধান্য, সে সাধনপ্রক্রিয়া কর্মজ। অথচ বাউলধর্মে তার অস্বীকৃতি ঘোষিত হওয়ায় স্বভাবতই তান্ত্রিক সম্প্রদায় একে সুদৃষ্টিতে দেখেনি। বাতুল অপবাদ এর ফল। সংসারে সংসারী সাধারণ ব্যক্তির ফলে প্রীতি এবং কর্মে তার মনের বিশ্বাস। তাই তন্ত্রের কর্মদ্বারা ফলপ্রাপ্তির নির্দেশ সংসারে ব্যক্তিমনে সহজেই রেখাপাত করে, এ নির্দেশ সংসারীর বেশ মনোমত। এই কারণে ব্যক্তিমনে তন্ত্রের প্রভাব বাউলের চেয়ে অনেক বেশী। এই প্রভাবে পড়েই ব্যক্তির কাছে কর্মে অবিশ্বাসী বাউল সম্প্রদায় বাতুল, কিন্তু তান্ত্রিক আচার্যেরা কর্মের মাহাত্ম্য দেখিয়ে কর্মের জয়গান করলেও কাজের ফাঁকে আত্মা আপন সার্বভৌমিকতার প্রকাশ করেন। এইজন্যই ব্যক্তির মন কর্মে থাকলেও বাউলগানে তার প্রাণে বিবশতা আসে, আনন্দ জাগে। জগতে কর্মের প্রাবল্য সত্ত্বেও আত্মার জয় হয়।[১] কর্মের পরাজয় ঘটে, কিন্তু পরাজয় ঘটলেও ব্যক্তি কর্মে সন্দিহান হয় না, অন্তরে যার পরাজয় ঘটে, বাহিরে তারই জয়ধ্বজা তুলে আত্মভাবকে অকুণ্ঠচিত্তে 'বাতুল' বলে কর্মের জয় ঘোষণা করে।

১ মানুষের আত্মা মানুষের কাজের চেয়ে বড়ো।

—সঞ্চয়, রবীন্দ্রনাথ

বাউলগানে কাব্যত্ব

যে ভাষিক অভিব্যক্তি হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ সাধন করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটায়, তাই সাহিত্য বা কাব্য। এ মিলনের যোগ-সূত্র আত্মার আনন্দ। আনন্দের ক্ষেত্র যোগের ক্ষেত্র। কবি আপন আনন্দের প্রেরণায় কাব্য রচনা করেন, সেটি তাঁর উপলব্ধ আনন্দের প্রকাশ। তা পাঠকচিত্তের প্রসুপ্ত আনন্দকে উদ্বোধিত ক'রে তোলে—সে আনন্দ পায়। সাহিত্যের উৎস আনন্দে, প্রকাশ আনন্দে এবং পরিণতি আনন্দে। আনন্দময়তাই সাহিত্যের সংক্ষিপ্ততম সংজ্ঞা।

কাব্যের স্বরূপ

প্রশ্ন এই যে একের এই আনন্দ অন্যের নিকটও আনন্দের হয় কেন? বস্তুত কর্মজীবনের খণ্ড বিচ্ছিন্ন উপকরণ একের কাছে আনন্দপ্রদ হলেই অন্যের কাছে আনন্দের হয় না। কর্মের জগতে, বস্তুর জগতে কেবলই ব্যবধান। তাই ব্যক্তিবিশেষের রুচিতে বস্তুবিশেষ প্রীতির হয়, কিন্তু যেখানে আত্মার পরম ঐক্যের জগৎ, সেখানের সুরটি ঝঙ্কৃত হলেই তা প্রাণে প্রাণে সাড়া জাগায়, হৃদয়ে হৃদয়ে তার অনুরণন চলে। আমাদের প্রত্যেকের মাঝে আছে পূর্ণের বোধ, কিন্তু সংস্কারদোষে তা মায়ার দ্বারা আবৃত, প্রসুপ্ত। কাব্যের মধ্যে যখন পূর্ণানন্দের আভাস পাই, তখনই আমাদের অন্তর তাতে সাড়া না দিয়ে পারে না। হৃদয় স্পন্দিত হয়ে ওঠে—কাব্য পাঠে আমরা আনন্দ লাভ করি।

রচনার সাহিত্যিকতা কোথায়, কাব্যত্ব কোনখানে তা বিশ্লেষণাত্মক রীতিতে বোঝানো চলে না। কারণ বিচ্ছিন্ন উপাদানে কাব্য নেই, কাব্যপ্রাণ আছে সমস্ত জুড়ে এবং কাব্যত্ব বিচারের

একমাত্র উপায় এই সমগ্র সৃষ্টির যে প্রতিক্রিয়া পাঠকের চিত্তে, তার স্বরূপালোচনায়। কাব্য কবিহৃদয়ের বিশুদ্ধ আনন্দ সংবেদকে ব্যক্ত করে। এই ব্যক্ততা ভিন্ন এর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। যদি কোনো প্রয়োজনের তাগিদ থাকে, তবে সে একমাত্র নিজেকে ব্যক্ত করার তাগিদ, আন্তর প্রেরণায়। আনন্দের ব্যক্তিই কাব্য।

কাব্য আনন্দের ব্যক্তি

এই আনন্দ বা সৌন্দর্যের উপলব্ধি কবি মনে জাগায় প্রকাশের আর্তি বা আস্পৃহা। কাব্য এরই অভিজ্ঞান। প্রকৃতপক্ষে আনন্দই কাব্যের স্রষ্টা, ব্যক্তিবিশেষ নিমিত্তমাত্র। সে আনন্দ আপনার পূর্ণ উপলব্ধির আনন্দ। কাব্যসৃষ্টি স্রষ্টার আপন শাশ্বত প্রকৃতির পূর্ণ প্রতিকৃতি।

এক কোটি ঃ প্রেরণা, লেখক

এ হ'ল কাব্যের এক কোটির কথা। স্রষ্টার বা প্রেরণার কথা। অপর কোটি হ'ল শ্রোতৃহৃদয়ে বা পাঠকচিত্তে তার প্রতিক্রিয়া।

কাব্যপাঠে আমরা যে পরম প্রীতি লাভ করি সে বুদ্ধির বিচারে এর মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নয়।

ব্যক্তিজীবনে নানা সমস্যা, নানা প্রয়োজন। প্রয়োজন সাধনের জন্য মানুষ সদাই তৎপর। এর নিবৃত্তিতে তার তুষ্টি। কাব্যও কি মানুষের জীবনে প্রয়োজন নিবৃত্তির বহুবিধ উপায়ের অন্যতম? এর সংক্ষিপ্ত উত্তর নেতিবাচক। নীতি উপদেশদানও আদৌ এর উদ্দেশ্য নয়। বস্তুত নীতি উপদেশে জীবনকে কতোখানি প্রভাবিত করা যায়, আদৌ জীবনে নীতির কোনো স্থায়ী প্রভাব আছে কিনা, সে প্রসঙ্গে না এসে উপস্থিত এইটুকু বলি যে কাব্যকারের অন্তরে তেমনতর অভিলাষ থাকে না। কাব্য ভালোমন্দ বিচার ও নৈতিক পথনির্দেশের কর্তব্য গ্রহণ করেনি। আনন্দকে ব্যক্ত করাই তার কাজ। পূর্বেই বলা হয়েছে এই ব্যক্তিতেই তার সার্থকতা। একজন সত্যোপলব্ধির আনন্দকে প্রসারিত,

অন্য কোটি ঃ প্রতিক্রিয়া পাঠক

প্রয়োজন, নীতি

প্রকাশিত করে ধরেছে, অন্যে তা থেকে কোনো সাময়িক বাহ্যিক প্রয়োজন মেটাবে বলে নয়। কাব্য প্রবাহ, সে আনন্দের প্রবাহ।

কিন্তু এ প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত। এর আহ্বান তাই প্রচণ্ডতর। বাইরে থেকে যুক্তি দিয়ে এ আকর্ষণের বিচার সম্ভব নয়। অন্তরে তার অনিবার্যতা উপলব্ধি করার বস্তু। এ আকর্ষণকে বস্তুজগতের বিচারে নিষ্কারণ বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু বস্তুজগতের মানদণ্ড ত্যাগ করলে কারণ-নির্দেশ সম্ভব।

কাব্যের আকর্ষণ

এই কারণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে কাব্যের তাৎপর্য, তার উপজীব্যের মহিমা।

কবি সর্বভারমুক্ত নিত্যানন্দ পুরুষ। উন্মুক্ত, উদার, প্রসারিত বীক্ষণে তিনি প্রত্যক্ষ করেন বিশ্বকে, সত্যকে, আপন নিত্য শুদ্ধ সত্তাকে। কাব্যে তারই প্রকাশ।

আকর্ষণের কারণ

আমাদের জ্ঞান আবৃত, দৃষ্টি সঙ্কুচিত, বুদ্ধির জগতে আপন আপন বুদ্ধির শিখা জ্বালিয়ে আমরা জীবনে প্রাগ্রসর। তাই সত্যকে দেখার দৃষ্টি আমাদের নেই, সত্য উপলব্ধির শক্তি আয়ত্তাতীত। খণ্ডদৃষ্টি আমরা জীবনকে খণ্ড খণ্ড করি, নিজেকেও। আপন সত্তার উদার মহান রূপ দেখার সৌভাগ্য আমাদের ঘটে না। আমাদের জীবন এই খণ্ডের শব্দ-যোজনায় সৃষ্ট। কাব্যসঙ্গীতের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই।

তথাপি কাব্যসঙ্গীত শ্রবণে আমাদের আনন্দ জাগে। কারণ আবৃতজ্ঞান বদ্ধদৃষ্টি ও খণ্ডিতচেতনা হলেও আমাদের অগোচরে আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সত্যের বোধ বিদ্যমান। বুদ্ধির নির্মোকে জ্ঞান আবৃত হলেও সত্যের প্রকাশ যদি কোথাও হয়, তবে সহজেই তা নির্মোক ভেদ ক'রে চলে যায়, হৃদয়াভ্যন্তরে সুপ্ত চেতনাকে আঘাত করে। মূলগত ঐক্য, স্বরূপগত সাধর্ম্যের ফলে একটি তন্ত্রীতে আঘাতে অন্য তন্ত্রীর কম্পনের মতো সত্যের

শিল্পী · শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশ চেতনাকে যাদুমন্ত্রে সোনার কাঠির স্পর্শে উজ্জীবিত করে। তখন হয় আত্ম-আবিষ্কার। এই আত্ম-আবিষ্কারের পরিণতি আনন্দে। কাব্যপাঠ বা শ্রবণে পাঠক বা শ্রোতার সত্যকে অজ্ঞাতসারে স্বীকৃতিদানই নিজেকে আবিষ্কার। কাব্যবাণী, কাব্যসুর প্রাণে পৌঁছলে সে যেন বলে ওঠে—'আমি আছি।' এই 'আছি'-তেই চরম সত্যের, পরম ঐক্যের জয়ঘোষণা।

আত্ম-আবিষ্কার

এখন এই আনন্দবোধ বা চিত্তমুক্তির স্বরূপটি ভালো ক'রে বোঝা প্রয়োজন। প্রশ্ন উঠতে পারে সত্যের উপলব্ধি কি এতোই সহজসাধ্য, চেতনার জাগৃতি কি এমনই সহজলভ্য ? প্রকৃতপক্ষে তা কখনও সম্ভব নয়।

পাঠক-হৃদয়ের এই উপলব্ধি ঠিক সত্যের উপলব্ধি নয়, তার আভাস। সত্যের আভাসেও আনন্দ। তাই সহজানন্দময় কবির বাণী পাঠকচিত্তে আনন্দের উদ্বোধন করে।

এর স্থায়িত্বের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এ জগতে স্থায়ী আনন্দের আশা দুরাশা মাত্র। অন্তরের সুপ্ত আনন্দ বাহিরের উপলক্ষকে অবলম্বন ক'রে প্রকাশ পায়। এ শুধু সুপ্ত সত্তার ক্ষণিক জাগরণ মাত্র। আপন 'মানসমূর্তির' এই নিরীক্ষণ নিতান্তই সাময়িক। এ যেন চকমকির আলো, যতক্ষণ ঘর্ষণ, ততক্ষণ আলোকবিকিরণ। স্ফুলিঙ্গের চকিত চমক। নিষ্কম্প দীপশিখার অটুট স্থায়িত্ব এতে নেই। আনন্দের ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া মাত্র; অন্তরে তার সিংহাসন পাকা হয় না। তবু জ্ঞানের তারতম্য, সংস্কারের তারতম্য আনন্দের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে তারতম্যের সূচনা করে। যার আত্মিক উন্নতি যতো বেশি, তার অভিব্যক্তিও ততো ব্যাপক। বিষয় একই, কিন্তু পাত্রানুযায়ী প্রতিক্রিয়া।

আনন্দবোধ ও চিত্তমুক্তির স্বরূপ

এখন এই আনন্দরসাস্বাদন ব্যাপারটি কিছু বিচিত্র মনে হতে

পারে। আস্বাদকের বহির্জীবনধারার সঙ্গে কাব্যরসধারার সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও সে আনন্দ লাভ করে কেন? উভয়ের অসামঞ্জস্য, অসঙ্গতি কেন রসগ্রহণে এবং নন্দন ব্যাপারে অন্তরায় হয়ে ওঠে না?

প্রকৃতপক্ষে আস্বাদকের জাগতিক চাওয়া পাওয়া, লাভ ক্ষতি, আশা নিরাশা, চিন্তা, চেষ্টা, স্মরণ, মনন, এককথায় তার সমগ্র বহির্জীবনচর্যার সঙ্গে এর কোনো প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও, আস্বাদ্য সঙ্গীতের ভাববস্তু এবং আস্বাদকের সংসার জীবনযাত্রা—এ দুটি সামঞ্জস্য-বিহীন, সমান্তরাল হলেও ক্ষতি নেই। রিপুপ্রভাবিত, ভোগসর্বস্ব জীবন যার কাছে সত্য, প্রিয়, আকর্ষণের বস্তু কবির কাব্যের শান্তরসমণ্ডিত সুরও তার কাছে সত্য, প্রিয় এবং আকর্ষণের সামগ্রী। একদিকে স্বার্থিক সংসার, অন্যদিকে কাব্যসঙ্গীত এই দুই বিরোধী বস্তুতে প্রীতি কীভাবে সম্ভব এমনতর জিজ্ঞাসা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এর উত্তর নিহিত রয়েছে মানবিক বোধ-দ্বৈধে, দুই কোটিতে তার জীবনধনুর জ্যা রোপণে। স্বার্থিক সংসার মনের চাওয়াকে পূর্ণ করে, কিন্তু বঞ্চিত প্রাণের চাওয়া পূর্ণ হয় কাব্যে।

আস্বাদন ব্যাপার

এইবার এই প্রসঙ্গের শেষ কথা। এই যে কাব্যের প্রতিক্রিয়া, একের বাণীর অন্যের হৃদয়ে অনুপ্রবেশ, একের সুরের অন্যের অন্তরে অনুরণন, এর মূলগত শক্তিটি কোথায়? কাব্য এবং কাব্যকার যে অন্যের আন্তরিক স্বীকৃতি লাভ করে, সে কিসের জোরে?

মূলগত শক্তি

কাব্যের হৃদয়ান্তরে গতির এই অনিবার্যতা শুধু তখনই সম্ভব, যখন কবির আপন উপলব্ধিতে কোনো ফাঁক বা ফাঁকি না থাকে। কবিহৃদয়ের এই সহজভাবের প্রকাশ যদি সহজে ঘটে, তবেই কাব্যের বহুজনমনে গতি সম্বন্ধে আর সংশয় থাকেনা। সহজভাবের সেই সহজ প্রকাশ পাঠক-হৃদয়েও সহজ প্রবেশলাভের পথে বাধাগ্রস্ত হয় না। কবির বোধের বা উপলব্ধির সেই

ঐক্য

তেজ অন্যকেও অনুভব করায়, তাঁর হৃদয়ের দোলা হৃদয়ান্তরেও দোলা দেয়। এই দোলার রহস্য বিশ্বের মূল রহস্য—তা হ'ল ঐক্যের রহস্য।

বাউলগানের কাব্যবিচার

কাব্যের এই মানদণ্ডে বাউলগানের কাব্যত্ববিচার করতে গেলে প্রথমে দৃষ্টিপাত করতে হয় এর প্রকাশের দিকটাতে—কাব্যের যা প্রথম কোটি। অর্থাৎ সঙ্গীত রচনার মূলে যে প্রেরণা বর্তমান, রচনার যা আদি উপাশ্রয় এবং তারপর গীতের উপজীব্য উপাদান, গীতান্তর্গত ভাবব্যঞ্জনা।

উৎসমূলে আনন্দ

মোহমুক্ত জ্ঞানের দৃষ্টিতে বীক্ষণের ফলে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ বাউল কবির নিকটে বিজ্ঞাত। বিজ্ঞানী বাউলের অন্তরে তাই জাগতিক দুঃখের ছায়া নেই। সে সহজানন্দময়। এ অবস্থায় জাগতিক বিষয়ে কোনো আসক্তি থাকে না, যে আসক্তি মানুষকে কর্মে লিপ্ত করায়। বস্তুত কর্ম করার সচেতন প্রয়াস আদৌ থাকে না, শুধু জাগতিক নিয়মে কর্মের সে উপলক্ষ হয় মাত্র। বাউল-কবির কাব্যের ক্ষেত্রেও তাই। কাব্যরচনার সচেতন প্রয়াস বাউলের নেই। 'আমি কাব্য রচনা করব'—এই বোধে বাউল রচনাকার্যে প্রবৃত্ত হয় না। সহজানন্দময় অবস্থায় আনন্দই হয় কর্তা, ব্যক্তি শুধু উপলক্ষ মাত্র। এক্ষেত্রে তাই কাব্যকে 'সৃষ্টি' না বলে 'প্রকাশ' বলাই যুক্তিযুক্ত।

সৃষ্টি ও প্রকাশ

স্রষ্টার সৃজনক্রিয়ার পূর্বে সৃষ্টির রূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে, তার অভীপ্সিত বস্তুর হুবহু রূপায়ণ ঘটে বাস্তবে। তখনই হয় সৃষ্টি। কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। সেখানে সৃষ্টির এদুটি বৈশিষ্ট্যই (সৃজন ব্যাপারে ব্যক্তির কর্তৃত্ব ও সচেতনতা এবং প্রাক্‌সৃজনপর্বে সৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা) অবর্তমান। এখানে আনন্দের রাজত্ব, আনন্দের কর্তৃত্ব, যাকে কর্তা বলে ভ্রম হয়, বাহ্যত সে শুধু নিমিত্তমাত্র। আর সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্যক্তির ধারণাও থাকে না, তাই আপন প্রকাশ আপনাকে বিমুগ্ধ, বিস্মিত করে।

বাউলসঙ্গীত রচনার মূলে প্রেরণা-স্বরূপ যা রয়েছে, তা বিশুদ্ধ আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রেরণামূলে আনন্দ থাকলেও বাউলগানের সঙ্গে সাধারণ কাব্যের ভাবগত ব্যবধান আছে।

ভাবগত বৈশিষ্ট্য

কাব্যমাত্রেরই উৎপত্তির মূলে আছে ভাব। কাব্য ভাবে লেখা। কাব্য ও অ-কাব্যের মধ্যে এখানেই পার্থক্য। ভাবের অভাব অকাব্যের প্রধান নিদর্শন, সেখানে আছে শুদ্ধ বিবৃতিমাত্র। এ প্রসঙ্গে পরে আবার আসছি। উপস্থিত বাউলগানের ভাবগত বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ আলোচনা করা যাক।

'ভাব'

জ্ঞানময় আত্মা যখন কায়া নিয়ে জগতে আসে, জ্ঞানের আলোও তখন মায়ার ছায়ায় আবৃত হয়। জ্ঞান সানন্দে অজ্ঞানকে স্বীকৃতি জানায়, বরণ করে।[১] সৃষ্টি হয় অহংবুদ্ধির। আপন সহজ স্বভাব বিস্মৃত হয়ে দেহী জাগতিক কর্মেই আমিত্ব আরোপ ক'রে ভাবে এটাই তার স্বরূপ। তার চোখে বিষয় ও বিষয়ীর কোনো ব্যবধান থাকে না। যদিও মূলত ব্যাপারটি প্রহসনেরই মতো। কারণ আলোর উপলব্ধিতে অন্ধকারের পরম প্রয়োজন থাকলেও অন্ধকারই আলো নয়। তাই অন্ধকার দেখা দিলেই আলো সরে দাঁড়ায়, অথচ এই ভ্রমটি ব্যক্তির 'ভাব'। কিন্তু ছায়াপথের প্রান্তে আলোকের স্পর্শ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তির ভাবান্তর ঘটে। জ্ঞানের উদয়ে জ্ঞানময় জীব আলোছায়ার পার্থক্য উপলব্ধি করে। এতোদিন যে সে অনিত্যকেই নিত্য, অসহজকেই সহজ এবং জগৎকেই পরম সত্য বলে একান্ত ক'রে ধরেছিল এ আর তার মনের অগোচর থাকে না। এই জ্ঞানময় অবস্থাতেও ব্যক্তির উপরে মায়ার প্রলেপ সম্পূর্ণ দূরীভূত না হলেও, ব্যক্তি জাগতিক কর্মবন্ধনের হাত থেকে নিশ্চিন্ত নিষ্কৃতি না পেলেও

---
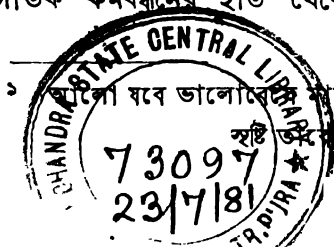
১ আলো যবে ভালোবেসে মালা দেয় আঁধারের গলে
সৃষ্টি তারে বলে। —রবীন্দ্রনাথ

জ্ঞানের উদয়ে এ মায়া আর তাকে বশীভূত ও বিভ্রান্ত করে না। এ অবস্থাতেও জীবের 'ভাব' থাকে। তবে অজ্ঞানময় অবস্থার 'ভাবের' সঙ্গে তার অতলস্পর্শ ব্যবধান।

এই ভাবে-বোঝা স্বরূপের জন্য ব্যক্তির ঐকান্তিক আস্পৃহা জাগে। সেই ভাবের প্রকাশেই কাব্য রূপ ধরে। এই ভাব যতক্ষণ কাব্যও ততক্ষণ। ভাবের বিনাশে কাব্যের বিনাশ। সেখানে স্বরূপ জ্ঞানের পূর্ণ উদয়। সেখানে কাব্য নেই, কর্ম নেই, বিষয়ের লেশমাত্র নেই। মায়াময় সুদীর্ঘ জীবনের, উপান্তে, সংখ্যাতীত জন্মমরণের পরিসমাপ্তিতে সেখানে ব্যক্তির মুক্তি। জীবের এ পরম কাঙ্ক্ষিত চরম অবস্থা। এর কথায় আমাদের প্রয়োজন নেই।

ভাব ও কাব্য

কাব্যরচনার অত্যাবশ্যক উপাদান যে ভাব তার স্বরূপটি আলোচনা করা হ'ল। এখন এর রূপভেদটি[১] স্পষ্ট ক'রে বুঝে নিতে হবে। প্রথমেই দেখা গেছে এ ভাবের দুই রূপ। প্রাক্‌বিজ্ঞান যুগে ব্যক্তির ভাব এবং জ্ঞানময় অবস্থায় ব্যক্তির ভাব। পূর্বেই বলা হয়েছে প্রাথমিক অবস্থায় বিষয়ের রাজত্ব, অহংবুদ্ধির প্রাবল্য। আবৃত-জ্ঞানের কর্মেই আমিত্ব আরোপ। অজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাই কেবলই বিচ্ছিন্নতা, খণ্ডতা, বিভিন্নতা, শুধুই ব্যবধান ও বিরোধ। জগৎ শুধুই বিরোধী বহুর বিরাট আধার

ভাবের রূপভেদ

১
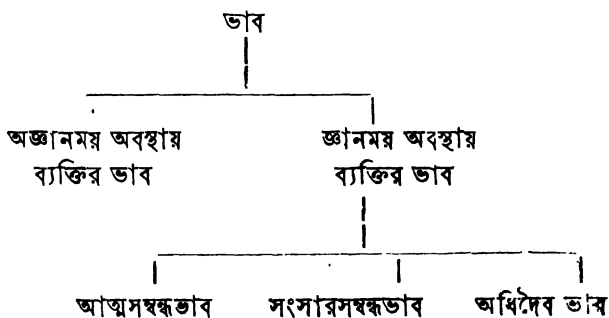
বলে প্রতীয়মান হয়। এ অবস্থায় দৃষ্টি থাকে বিষয়ে অর্থাৎ রূপে। রূপটাই তখন স্বরূপ বলে বোধ হয়।

কিন্তু জ্ঞানের উদয়ে স্বার্থিক বিষয়ের নির্মোক খসে পড়ে, তার অসারত্ব প্রতিপন্ন হয়। ব্যক্তির ভাবান্তর ঘটে। কর্মে কর্তৃত্ব আরোপ যে ভ্রান্তি, এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে কর্মে কর্তৃত্বের অনিবার্য

মোহমুক্তের ভাব

আকর্ষণ আর থাকে না, কর্মের পিছুতে ছোটার পালা শেষ হয়, সুরু হয় 'মন ফেলে ছোটা' অর্থাৎ ছুটি। বিষয়কে আঁকড়ে ধরার প্রবৃত্তি দূর হয়, মুষ্টি হয় শিথিল, ব্যক্তি নির্বিশেষ, নিরাসক্ত, উদাসীনের আসন গ্রহণ করে। এ শুধু উদাসীন দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখা নয়, আপনাকেও আপনার বাইরে থেকে দেখা। বিলুপ্ত-বাসনা উদাসীন ব্যক্তি তখন সহজের স্রোতধারায় আপনাকে ভাসিয়ে দেয়। এখানে সসীম প্রয়াসের স্বার্থিক চাঞ্চল্যের মোহ কেটে যায়। দুরাশার দুরন্ত বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে। 'মুগ্ধ মনের দানে' যে স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল, তা যখন আপনি ধ্বংস হয়, তখনই সংসারের ছায়ানাট্যের স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয়। আর স্বরূপোদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে। সে দৃষ্টি হয় স্বচ্ছ, সহজ, মোহের অঞ্জনটুকু মুছে যায়। এই অঞ্জনেই থাকে মমত্ব। তাই মোহমুক্তির পর সহজদৃষ্টি হয় মমত্বহীন, সেখানে শুধু আনন্দ। মুক্ত, স্বচ্ছ, স্বতন্ত্র, নিত্যকালের অকিঞ্চন আমি আনন্দময়। স্বরচিত মনোমোহন জগৎ তখন বর্ণহীন, বিরস, বিরূপ। স্বার্থিক জীবনের রিক্তপাত্রে তখন অলস ঔদাসীন্য ও শুষ্ক অবহেলা। বোধের এই অভ্যুদয়ে বুদ্ধির পরিনির্বাণ।

জ্ঞানময় অবস্থায় ব্যক্তির যে ভাব, তার তিনটি রূপ। একটিকে আখ্যা দেওয়া যায় 'আত্মসম্বন্ধ ভাব'। দ্বিতীয়টিকে 'সংসারসম্বন্ধ ভাব' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এবং তৃতীয়টি 'অধিদৈব ভাব'। মনের এই তিন অবস্থা।

সংসারের উপান্তে এসে উদাসীন দৃষ্টিতে জীবনকে ফিরে দেখায় অনাসক্ত মনে এক ভাব জাগে। সংসক্ত না হয়েও এই যে সচেতনতা, এর ফলে যে ভাব, তাকে নামাঙ্কিত করা হ'ল 'সংসার-সম্বন্ধ ভাব' নামে। আর জগতের অস্তিত্বকে উপেক্ষা ক'রে শুদ্ধ আত্মার ধ্যান ও চিন্তা, স্বরূপের স্মরণ, সেও জ্ঞানময়ের এক অবস্থা। এখানে 'উপেক্ষা' যে শব্দটি প্রযুক্ত হ'ল, তাকে 'অস্বীকৃতি'র সঙ্গে অভিন্নার্থক করলে ভুল হবে। এ অস্বীকার নয়, সাময়িক বিস্মৃতি বা ঈষৎ অসচেতনতা। এই অবস্থাকে নামাঙ্কিত করা যায় 'আত্মসম্বন্ধ ভাব' বলে। প্রথমাবস্থায় জ্ঞানী, নির্লিপ্ত নিরীক্ষণে দেখেন জগৎকে, জীবনকে, সংসারকে। দ্বিতীয় অবস্থায় তাঁর ধ্যান, তাঁর স্মরণ, মনন, চিন্তা হয় আত্মকেন্দ্রিক। জ্ঞানময় অবস্থায় ব্যক্তির ভাবের এই হ'ল দুইরূপ।

মুক্তির ভাবের ত্রিরূপ

আত্মসম্বন্ধ ভাব ও সংসারসম্বন্ধ ভাব ছাড়া তৃতীয় যে ভাব তার নাম অধিদৈব ভাব। আত্মসম্বন্ধ ভাবের ন্যায় এখানেও ব্যক্তি আত্মযুক্ত। কিন্তু পার্থক্য এই যে আত্মভাবাবস্থায় শুদ্ধ আত্মার ধ্যান। আর এখানে স্বরূপের জ্ঞানকে ভিত্তি ক'রে জগতের অনিত্যতাবোধ প্রবল। আত্মভাবে সংসার-সচেতনতা নেই, সে কথা পূর্বেই বলেছি। সেখানে সংসার-বিস্মৃতিই ব্যক্তির ধর্ম। কিন্তু অধিদৈব অবস্থায় সত্যজ্ঞানের সঙ্গে সংসার-সচেতনতা সমান ভাবে বর্তমান। ব্যক্তি সংসারের অসারত্ব, কর্মে কর্তৃত্বের অসারতা সম্বন্ধে সদাসচেতন। তাই এ অবস্থায় সংসারভাবের নিরসন প্রবল। আত্মভাবের সঙ্গে এখানেই এর পার্থক্য।

কাব্যের রূপভেদ

পূর্বেই বলা হয়েছে কাব্যের মূলে আছে ভাব। কাব্য ভাবে লেখা। ভাব যখন কাব্যের উপাশ্রয়, তখন ভাবের রূপবৈচিত্র্য কাব্যেরও রূপের ভিন্নতা ঘটায়। ভাবানুযায়ী কাব্যের রূপ ধরে।

অজ্ঞানময় অবস্থায় ব্যক্তির যে ভাব সেই ভাবে যে কাব্যের সৃষ্টি, তা হ'ল সাধারণ জড়জগতের তথাকথিত 'বাস্তব' সাহিত্য।—সেখানে বুদ্ধির প্রাধান্য, অহঙ্কারের রাজত্ব। ভালোমন্দ, নীতি, আদর্শের সেখানে ছড়াছড়ি। শিল্পী সেখানে বিশ্বকর্মার সমধর্মী।[১] এ কাব্য আধিভৌতিক কাব্য। এখানে জগৎ সংসারকেই একান্ত ক'রে দেখা, অসত্যের সত্য ভ্রান্তিতে বর্ণনা, অস্বরূপের বন্দনা। এই শ্রেণীর কাব্যের একটু উদাহরণ দিই।—

আধিভৌতিক কাব্য

'প্রিয়ার ও তনু অতনু সে কোন
দেবতার মন্দির।
বন্ধনহীন মন উদাসীর
আলয় যে শান্তির।
তাহারে ঘিরিয়া ঘুরিছে হৃদয় ঘুরিছে রাত্রিদিন
উৎসুক সুখে কৌতুকে তারে করিছে প্রদক্ষিণ।'

অথবা—

'অধরে রঙ্গের হাস বিদ্যুতের পরকাশ
কেশের তরঙ্গে নাচে নাগরে কুমারী ;
বাসন্তী ওড়োনা-সাজে প্রকৃতি রাধিকা নাচে,
চরণে ঘুঙুর বাজে আনন্দে ঝঙ্কারি।
নগনা দোলনা কোলে মগনা রাধিকা দোলে
কবিচিত্তে কল্পনার অলকা উসারি'—
আমি সে অমৃত-বিষ পান করি অহর্নিশ
সংসারের ব্রজবনে বিপিনবিহারী।'

দৃষ্টি এখানে আত্মায় নয়, একান্তভাবেই দেহে বা রূপে নিবদ্ধ। কাব্য দেহজ বা রূপজ প্রীতির রূপায়ণ।

এ কাব্যের কথায় আমাদের প্রয়োজন নেই।

[১] মানুষের অহঙ্কারপটেই বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।

—রবীন্দ্রনাথ

জ্ঞানময় অবস্থায় বা সহজাবস্থায় ব্যক্তির যে ভাব, সেই ভাবেও কাব্যের রূপ ধরে। এ অবস্থায় কবি কাব্য সৃষ্টি করেন না। কবির প্রকাশ ঘটে কাব্যে।[১] অর্থাৎ কাব্যের সৃষ্টিতে কবি উপলক্ষ, নিমিত্তমাত্র। তাই আপন প্রকাশ কবির কাছে একান্তই অপ্রত্যাশিত, অভিনব। এই অভিনবত্বই আদি কবির মনে বিস্মিত প্রশ্ন জাগিয়েছিল—'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া'। এ কাব্য অচেষ্টিত, অচিন্তিতপূর্ব। কাব্য সৃষ্টিতে কবির এই নিষ্ক্রিয় গৌণতা রবীন্দ্র রচনার বিভিন্নস্থানে বিচিত্রভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে—

'আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই'

কিংবা

'মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে'

সুখদুঃখের অভিভূতির পারে কর্মবন্ধনহীন অপ্রমত্ত, শান্ত যে লোক, সেখানকার সৃষ্টি এ কাব্য। এ কাব্য নিরাসক্ত, নির্বিকার, নির্লিপ্ত, নির্মম শিল্পকলা। আলগা মনের 'হালকা বেলার' এ গান। এ কাব্য 'বাস্তবে'র কাব্য নয়, সত্যের কাব্য।[২] বাস্তবের জড়ত্ব নয়, সত্যের প্রাণ এর অন্তরে বিরাজমান। এ প্রাণের প্রকাশ সুরে—বিশ্ববাণীর যা অমৃতস্পর্শ।

কবি এ অবস্থায় জীবনের যে স্তরটিতে সমুপস্থিত, তার বিশেষত্বটি লক্ষণীয়। জীবনের এই ক্ষণটিকে বলা যায় সন্ধিক্ষণ। এর

১ দ্রষ্টব্য 'সৃষ্টি ও প্রকাশ', এই পরিচ্ছেদে।

২ কাব্য বলে বেঠিক কথা, এক হয়ে যায় আর,—
যেমন বেঠিক কথা বলে নিখিল সংসার।
বিশ্ব থেকে ধার নিয়েছি তাই আমরা কবি
সত্যরূপে ফুটিয়ে তুলি অবাস্তবের ছবি।

—রবীন্দ্রনাথ

একদিকে মায়াময় জগৎ, অন্যদিকে আলোকোজ্জ্বল অনন্ত। এই মহা-সন্ধিক্ষণে, জীবনের মহাসন্ধি-স্থলে দাঁড়িয়ে কবি নিরীক্ষণ করেন উভয় দিককেই, সমভাবে। মধ্যবর্তী শিখরচূড়ায় দণ্ডায়মান কবির ইহলোক ও পরলোকের সমদর্শন ঘটে।

সন্ধিক্ষণ

জীবনের এই বেলাটিই সন্ধ্যাবেলা। সন্ধ্যায় দিন ও রাত্রির মিলন। বুদ্ধির আলোকে দিনের সৃষ্টি, সে আলোক সুতীব্র, বিভ্রান্তকারী আর তেজ। সেই তেজে সে খান খান করে জগৎকে। সৃষ্টি হয় বহুরূপের। সেখানে নানা আঘাত সংঘাত। দিবসের খরতাপে বাতাস বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল। নিরন্তর আন্দোলিত, দ্বন্দ্ব-আলোড়িত ঘনজনতার কলকোলাহলে দিন অশান্ত—উদ্বেল।

বুদ্ধিসূর্যের অস্তগমনের শেষে অহঙ্কারের দিনাবসানে আসে রূপহীন, বর্ণহীন রাত্রি। অচঞ্চল স্তব্ধতা, সুগম্ভীর শান্তি ও সুমধুর স্নিগ্ধতা তার সম্পদ। বহুর স্রষ্টা বুদ্ধির দীপনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গে আকারগ্রাসী, পরিচয়গ্রাসী, সকল ব্যবধাননাশী রূপহীন রজনীর আবির্ভাব ঘটে। এই তিমির রাজ্য অসীম অরূপের রাজ্য। বুদ্ধির বিলয়ে এখানে বোধের প্রতিষ্ঠা।[১]

একদিকে মায়াময় বুদ্ধির জগৎ, বুদ্ধির সুপ্রখর আলোকদীপ্ত অশান্ত দিন। অন্যদিকে মায়াবিজ্ঞানোত্তর পর্বে নির্বাপিতদীপ সুগম্ভীর স্তব্ধ রাত্রি। এ দুইয়ের মাঝখানে শান্ত সন্ধ্যা।[২] জীবনের সন্ধ্যাবেলায় দাঁড়িয়ে দুটি কালকে সমানভাবে দেখা যায়। এই দৃষ্টিপাত বড় বিচিত্র। বন্ধনমুক্তির সীমানায় যে সংবেদ, সে বড় অদ্ভুত।

---

১ বুদ্ধি যখন এই বোধস্বরূপে লয় হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়; তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়। —শ্রীরামকৃষ্ণ

বোধের প্রত্যুষে যথা বুদ্ধির দীপ নাহি জ্বলে —রবীন্দ্রনাথ

২ (ক) ধীরে সন্ধ্যা আসে, একে একে গ্রন্থি যায় স্খলি
প্রহরের কর্মজাল হ'তে। দিন দিল জলাঞ্জলি

উত্তরবিজ্ঞান ও প্রাকনির্বাণ পর্বে জীবন সন্ধ্যাবেলায়[১] সমুপস্থিত দায়মুক্ত, মোহমুক্ত কবির কাব্যের ভাষাকে তাই বলা যায় সন্ধ্যাভাষা। আধিভৌতিক কাব্য ও কবির কথা বাদ দিলে কবির কাব্যের ভাষাই সন্ধ্যাভাষা।[২]

সন্ধ্যাভাষা

খুলি পশ্চিমের সিংহদ্বার
সোনার ঐশ্বর্য তার
অন্ধকার আলোকের সাগর সঙ্গমে।
—'আরোগ্য', রবীন্দ্রনাথ

(খ) আলো আঁধারের ফাঁকে দেখা যায়
অজানা তীরের বাসা
ঝিমি ঝিমি করে শিরায় শিরায়
দূর নীলিমার ভাষা। —'সেঁজুতি'

(গ) 'সন্ধ্যা'
দিনের রৌদ্রে বাজতে থাকে যাত্রা পথের সুর
অনেক দূর যে অনেক দূর।
ওগো সন্ধ্যা, শেষ প্রহরের নেয়ে
ভাসাও খেয়া ভাঁটার গঙ্গা বেয়ে।
পৌঁছিয়ে দাও কূলে
যেথায় আছ অতি কাছের দুয়ারখানি খুলে।
সন্ধ্যা ওগো, কাছের তুমি ঘনিয়ে এসো প্রাণে
আমার মধ্যে তারে জাগাও কেউ যারে না জানে।
সব কিছুরে সরিয়ে করো
একটু কিছুর ঠাঁই।
যার চেয়ে আর নাই। —'সেঁজুতি'

১ সন্ধ্যামিতি স্বপ্নস্থানমাচষ্টে বেদে প্রয়োগ দর্শনাৎ সন্ধ্যাং তৃতীয়স্বপ্নস্থানম্ দ্বয়োর্লোকস্থানয়োঃ প্রবোধস্প্রসাদ্ অস্থানয়োঃ সন্ধ্যৌ ভবতীতি সন্ধ্যাম্। ভাঃ। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতি ইহশ্চ পরলোকশ্চ—বৃহ্ন প্রঃ। —'বাচস্পত্য'

২ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রচনা বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণের 'চর্যাপদে'র ভাষাকে এই কারণেই সন্ধ্যাভাষা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যাভাষা অর্থে আলো আঁধারি বা দুর্বোধ্য ভাষা বা হেঁয়ালি ভাষা নয়।

সন্ধ্যাবেলার কাব্যে কবির অসংসক্ত, শান্ত প্রাণের প্রকাশ ঘটে। কাব্যে তাই শান্তসুরের সঞ্চরণ। এ সুর অসীমের সুর, উদাস বৈরাগ্যের সুর, সহজ সুর। এর পরে আছে নটরাজের প্রসাদ। প্রতিপ্রাণে এর সহজ সংক্রমণ। কারণ ব্যক্তির কাছে এ অচেনা হলেও চেনা। সে কথায় পরে আসছি।

কাব্যের ত্রিরূপ

পূর্বে বলা হয়েছে উত্তরবিজ্ঞান ও প্রাক্‌নির্বাণ যুগে জীবনের ধূসর সন্ধ্যায় ব্যক্তির ভাবে ত্রিরূপের সৃষ্টি হয়। যার নামাঙ্কন হয়েছে—(১) সংসারসম্বন্ধ ভাব, (২) আত্মসম্বন্ধ ভাব ও (৩) অধিদৈব ভাব। গোধূলি বেলার কাব্যেরও তাই তিনটি রূপ।

গুণময়মায়ার ছায়াপথের প্রান্তে এসে অলস মনে উদাসী দৃষ্টিপাত সংসারকে নূতনরূপে দেখায়। সংসারের মধ্যে থেকে সংসারকে দেখা এক, বাইরে থেকে দেখা আর। একটিতে বন্দীর বেদনা, অন্যটিতে জীবনমুক্তের আনন্দ। সংসার-সংসক্ত আপন সঞ্চয়-প্রয়াসী। অবশ মনের আবেশে কাজের বোঝা বাড়িয়ে তুলে আপনাকে সে আপনি করে বিজড়িত। তার আপন হাতের গড়া শৃঙ্খল তাকে সুখ দিলেও আনন্দ দেয় না। তথাপি প্রতি দিনের এই দুঃখবোধে শৃঙ্খলিত জীবনের সমাপ্তি ঘটে না। কারণ নিত্য নূতন বেড়ির সৃষ্টি হয়, এক ভাঙ্গে, আর এক গড়ে।

এই ভাঙ্গাগড়ার পর্ব শেষ হয় তখন, যখন অহঙ্কারের আবরণ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর, ক্ষীণতম হয়ে অবশেষে লোপ পায়। 'অলস মনের আকাশে' তখন প্রদোষ নামে। বর্ষাশেষে জলভারহীন শরৎকালের উদাসী মেঘের মতো জীবনের সুখ দুঃখ তখন শুধু আসে, আর যায়। এই গোধূলিক্ষণে জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাতের স্বরূপটি বিশেষত্বময়। মধুলোভী ভ্রমর যখন মধুপান-নিরত, তখন ফুলের সৌন্দর্য দেখার তার অবকাশ ঘটে না। ভোগের পরিসমাপ্তিতে দেখার দৃষ্টি জাগে। গুণময় মায়ার সংসার-উপান্তে এই দৃষ্টি লাভ

হয়। নিত্যকালের আলোকস্পর্শে তখন সব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দেখা দেয় সুন্দর। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সংসারের ছায়ানাট্যলীলা আত্মপ্রকাশ করে। তার প্রারম্ভ থেকে পরিসমাপ্তি ভৈরবীর সুর অনুরণিত। তখন শুধু 'পথ চাওয়াতেই আনন্দ'। এই আনন্দই বিজ্ঞান-উত্তরকালের সংসারসম্বন্ধ-ভাবে রচিত কাব্য সাহিত্যের প্রাণ। একে বলা যায় 'আধ্যাত্মিক কাব্য'।

আধ্যাত্মিক কাব্য

আধিভৌতিক কাব্যে মমত্ব, সংসারসম্বন্ধ-ভাব-ভিত্তি আধ্যাত্মিক কাব্য মমত্বহীন, আনন্দময়। এ কাব্য মমতাহীন সৃষ্টি-লীলার কাব্য। এখানে সংসারের কথা আছে। জীবনের সুখ দুঃখ বেদনার কথা আছে। কিন্তু তা কবির কাছে স্পর্শহীন, বিগত-বেদন। সংসার-বিষয়ক হয়েও তাই এ জড়ের সাহিত্য নয়। প্রাণপ্রবাহময়।[১] প্রাণময়তার জন্যই ভোগের কথাতেও এখানে 'অধরা মাধুরী' ধরা দেয়। এইভাবে সংসারীর কর্মভাবের স্বরূপ প্রকাশ করে। বচনীয়ের সঙ্গে অনির্বচনীয়ের মিলন ঘটায়।

নির্মম, আনন্দময়

মানবহৃদয় ও মানবচরিত্রকে উপজীব্য ক'রে আধ্যাত্মিক সাহিত্য কর্মভাবের নির্দেশ দেয় বলেই তার প্রতিক্রিয়া সর্বজনীন এবং সর্বকালিক। প্রতি পাঠকচিত্তে সংস্কারানুযায়ী তার প্রতিক্রিয়া ঘটে। ভোগের কথায়, কর্মের কথায়, হৃদয়ানুভূতির কথায় চিত্তে বিশেষ বিশেষ বোধের সঞ্চার হয়। সে বোধ সৃষ্টি করে রসের। রসের পরিণতি আনন্দে। এই জন্যই আধ্যাত্মিক

সর্বজনীন ও সর্বকালিক রসপ্রধান সাহিত্য

১ যেখানে বিদ্যুৎ-স্বপ্নছায়া
করিছে রূপের খেলা, পরিতেছে ক্ষণিকের কায়া
আবার ত্যজিয়া দেহ ধরিতেছে মানসী আকৃতি
সেই তো কবির কাব্য। —রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্যকে আখ্যা দেওয়া যায়—রসপ্রধান সাহিত্য। এ সাহিত্যের একটু নমুনা দিই।

'কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন,
তাই কেমন হয়ে আছিস সারাক্ষণ
হাসি যে তাই অশ্রুভারে নোওয়া,
ভাবনা যে তাই মৌন দিয়ে ছোঁওয়া,
ভাষায় যে তোর সুরের আবরণ॥
তোর পরাণে কোন্ পরশমনির খেলা,
তাই হৃদগগনে সোনার মেঘের মেলা।
দিনের স্রোতে তাই তো পলকগুলি
ঢেউ খেলে যায় সোনার ঝলক তুলি,
কালোয় আলোয় কাঁপে আঁখির কোণ॥'

—গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ

অথবা,

'আজিকে তুমি ঘুমাও আমি জাগিয়া রব দুয়ারে
রাখিব জ্বালি আলো।
তুমি তো ভালো বেসেছ, আজি একাকী শুধু আমারে
বাসিতে হবে ভালো।
আমার লাগি তোমারে আর হবে না কভু সাজিতে,
তোমার লাগি আমি
এখন হতে হৃদয়খানি সাজায়ে ফুলরাজিতে
রাখিব দিনযামী॥
তোমার বাহু কতনা দিন শ্রান্তিসুখ ভুলিয়া
গিয়েছে সেবা করি,
আজিকে তারে সকল তার কর্ম হতে তুলিয়া
রাখিব শিরে ধরি।
এবার তুমি তোমার পূজা সাঙ্গ করি চলিলে
সঁপিয়া মনপ্রাণ
এখন হতে আমার পূজা লহ গো আঁখি সলিলে
আমার স্তবগান॥'

—একাকী, স্মরণ

সান্ধ্যকাব্যের অপর একটি রূপ, যার উপাশ্রয় 'আত্মসম্বন্ধভাব', সেও আধ্যাত্মিক কাব্যের অন্তর্গত। এখানে শুদ্ধ আত্মার ধ্যান, আত্মার কথা, মুক্তির কথা। এই আত্মার ধ্যান আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নির্দেশক নয়। স্বভাবের দ্বারা আত্মার যেমন স্বরূপবোধ হয়, তেমনি স্বরূপের প্রকাশ। তাই এসব কাব্য আত্ম-উপদেশক নয়, আধ্যাত্ম-উপদেশক। এখানে ইহলোক-প্রসঙ্গত পরলোক-প্রাধান্য বা আত্মার প্রাধান্য।

আধ্যাত্মিক কাব্যের অপর রূপ

আত্মভাবে রচিত আধ্যাত্মিক কাব্য ব্যক্তির কর্মবিশেষের প্রশস্তি করে না, করে আত্মার প্রশস্তি। ভোগের রূপ ও রীতি, কর্মের ধারা ও ধরণ এর আলোচ্য নয়। এখানে একভাব-প্রাধান্য (directiveness)। একভাব-প্রাধান্য কাব্যকে করে এক-মুখী। ফলে বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন জনার কাছে তার বিচিত্র অর্থ সৃষ্টির সম্ভাবনা স্বল্প নয়, অসম্ভব হয়। ভোগ বা কর্মকথায় ব্যক্তির সংস্কারানুযায়ী সংবেদের সৃষ্টি হয়। তাই একই কাব্যের বহু অর্থ দেখা দেয় বহুজনার মনে বিভিন্ন অবস্থায় বা কালে।[১] কাব্য হয় সর্বকালিক। কিন্তু এক-ভাব প্রাধান্যের ফলে আধ্যাত্মিক আত্মসম্বন্ধ ভাব-ভিত্তি কাব্য সর্ব অবস্থা বা সর্বকালের গ্রহণযোগ্য হওয়া কঠিন।

সর্বকালিকতা ক্ষুণ্ণ

কর্মভাবের নির্দেশের অবর্তমানতা আত্মভাবে রচিত কাব্যকে শুধুমাত্র যে পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য দান করেছে, তা নয়। পূর্বোক্ত কাব্যের সঙ্গে অন্য একটি অসামঞ্জস্যেরও সৃষ্টি করেছে। পাঠকের হৃদয়ে কর্মকথায় 'রসসৃষ্টি' ঘটে, আত্মকথায় কিন্তু রসসৃষ্টি সর্বত্র ঘটে না। সাধারণের কাছে এ কাব্য তত্ত্বমূলক, রসমূলক নয়। শুদ্ধ যে-পাঠক বা শ্রোতা কবির

তত্ত্বমূলক

১ কে কেমন করে অর্থ তাহার।

—রবীন্দ্রনাথ

সঙ্গে সমস্তরে, একই অনুভূতিলোকে বিচরণশীল, সেই পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে রস-সঞ্চরণ ঘটে। সাধারণ পাঠক যেমন কর্মভাবের কাব্যে, এঁরা তেমনি আত্মভাবের কাব্যে রস পান। পূর্বে এ কাব্যকে 'তত্ত্বমূলক' নামে অভিহিত করেছি। কিন্তু এ তত্ত্ব আনন্দহীন নয়, এ তত্ত্ব সত্যের তত্ত্ব। তত্ত্বমূলক আধ্যাত্মিক রচনা তাই কাব্য। আত্মভাবাশ্রিত কাব্যের কিছু উদাহৃত করি—

'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
গানের ওপারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ
আমি পাইনে তোমারে
বাতাস বহে মরি মরি
আর বেঁধে রেখ না তরী
এসো এসো পার হয়ে মোর
হৃদয় মাঝারে।'

কিংবা,

'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারই হউক জয়
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারই হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে—
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারই হউক জয়।
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়,
তোমারই হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়
তোমারই হউক জয়।

প্রভাত সূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে—
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমরই হউক জয়॥'

সান্ধ্যক্ষণের সংসারসম্বন্ধ ও আত্মসম্বন্ধ ভাবে রচিত কাব্য আধ্যাত্মিক কাব্য। আর অধিদৈব ভাবে রচিত কাব্য আধিদৈবিক কাব্য।[১] আত্মযুক্ত হয়ে এ কাব্য রচিত হলেও আত্মার প্রশস্তিমাত্র এর উপজীব্য নয়। পরন্তু স্বরূপজ্ঞানকে ভিত্তি ক'রে এর মধ্যে অস্বরূপের নির্দেশ থাকে। নিত্যযুক্ত কবি অনিত্যের সমালোচনা করেন। জগতের, জীবনের অনিত্যতা ও ক্ষণিকতার পর্যালোচনা এর অন্যতম প্রধান উপজীব্য।

আধিদৈবিক কাব্য

এ কাব্য সংসারসম্বন্ধ-ভাব-ভিত্তি আধ্যাত্মিক কাব্যের মতো কর্মভাবের নির্দেশ দেয় না। কর্মে কর্তৃত্বের ব্যর্থতাকে বিবৃত করে। 'অহং কর্তা' ব্যক্তির এই বোধ যে একান্তই ভ্রান্তিমূলক, আধিদৈবিক কাব্যে বারংবার তারই উল্লেখ এবং বিশ্লেষণ। প্রথমেই বলে রাখি আধিদৈবিক প্রকাশ বস্তুত দার্শনিক প্রকাশ, প্রকৃত কাব্যিক প্রকাশ নয়। অনিত্যের সমালোচনা, ব্যক্তির ভ্রান্তি পর্যালোচনার এ প্রবণতা মূলত দার্শনিক প্রবণতা। এখানে কাব্যের সাধারণ ধর্মের

১
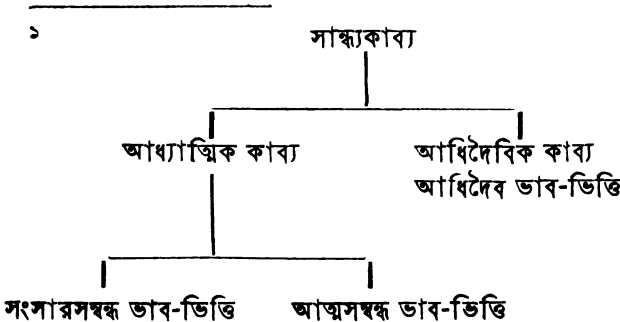
সঙ্গে এর অসামঞ্জস্য। তবুও আধিদৈবিক রচনাকে যে কাব্য পর্যায়ে স্থান দেওয়া হ'ল, তার কারণ আছে। সে কারণ ক্রমশ বিবৃত ও বিশ্লেষিত করছি।

বলা বাহুল্য আত্মসম্বন্ধভাবে রচিত আধ্যাত্মিক কাব্যের ন্যায় এ কাব্যও তত্ত্বমূলক। এখানে কবি তত্ত্বের প্রকাশ করেন। কিন্তু পূর্বকথার পুনরুল্লেখ করেই বলতে হয় যে এ তত্ত্ব সত্যের তত্ত্ব, তত্ত্বমূলক আধিদৈবিক রচনা তাই কাব্য।[১]

তত্ত্বমূলক

কর্মে কর্তৃত্বের ব্যর্থতা ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। তাই কাব্যে এর উল্লেখে সর্ব অবস্থায় না হলেও সর্বজন-চিত্তে সংবেদের সৃষ্টি হয়। মায়াগ্রস্তচিত্তে চেতনা জাগে। কর্মে কর্তৃত্ব আরোপ যে ভ্রান্তি, এ শিক্ষা হওয়ায় পীড়িত প্রাণে আনন্দের স্পন্দন জাগে। বলা বাহুল্য যে 'শিক্ষার' কথা বলা হ'ল, তা সাময়িক এবং ব্যক্তিচিত্তে স্থায়ী-প্রভাবহীন। এ শিক্ষা 'নীতিশিক্ষা' নয়, ক্ষণিক আনন্দের উদ্বোধনেই এর চরম পরিণতি। 'তত্ত্বমূলক' আধিদৈবিক কাব্যকে তাই শিক্ষামূলক নামেও অভিহিত করা যায়।

তত্ত্বার্থের দ্বারা অজ্ঞানময় ভাবের নিরসনে মোহগ্রস্ত জীবের মনে শিক্ষা এবং শিক্ষার ফলে আনন্দ জাগে। আধিদৈবিক কাব্যের বাণীতে ব্যক্তির স্তিমিত চেতনার জাগরণ ঘটে। আনন্দ এই জাগরণের পরিণতি। এ কাব্যকথা বাইরে থেকে মোহমুগ্ধজনের অপরিচিত ও অজ্ঞাত হলেও অন্তরে সে অতি পরিচিত। এই অজানাই তার পরম জানা। আত্মযুক্ত আধিদৈবিক কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাববস্তুটি এই রকম—

শিক্ষামূলক

১ তুমি বলবে এ যে তত্ত্ব কথা
আমি বলব, এ সত্য
তাই এ কাব্য।

—রবীন্দ্রনাথ

'কি লয়ে বা গর্ব করি
ব্যর্থ জীবনে
ভগ্না গৃহে শূন্য আমি
তোমা বিহনে।'

আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক কাব্যের পার্থক্যটি আর একবার সংক্ষিপ্তভাবে পুনর্বিবৃত করি তুলনামূলক আলোচনার আকারে।

আধ্যাত্মিক কাব্য সংসারসম্বন্ধ ও আত্মসম্বন্ধ ভাবে রচিত। আধিদৈবিক কাব্য অধিদৈব ভাবে রচিত। প্রথমটি একদিকে ভোগের কথাকে উপজীব্য ক'রে কর্মভাবের নির্দেশ দেয়, অন্যদিকে আত্মভাবের নির্দেশ দিয়ে আত্মার প্রশস্তি গায়। দ্বিতীয়টি আত্মযুক্ত হয়ে অজ্ঞানময় ভাবের নিরসন করে।

সংক্ষিপ্তসার

আধ্যাত্মিক কাব্য ইতিবাচক, আধিদৈবিক কাব্য মূলত নেতিবাচক। শেষোক্ত কাব্য সর্বজনীন হলেও সর্বকালিকতা অপেক্ষাকৃত ক্ষুণ্ণ। প্রথমটি আংশিক ভাবে সর্বভাবের প্রকাশক এবং আংশিক ভাবে একভাবপ্রধান, দ্বিতীয়টি শুধুমাত্র একভাবপ্রধান। প্রথমটি সাধারণের কাছে রসমূলক ও তত্ত্বমূলক, দ্বিতীয়টি তত্ত্বমূলক ও শিক্ষামূলক।

উভয় কাব্যের উৎসমূল এবং পরিণাম এক, পার্থক্য শুধু মধ্য দেশে। উভয়েরই আদি উপাশ্রয় আনন্দ এবং পাঠক-হৃদয়ে প্রতিক্রিয়ায় আনন্দ। যদিও এই আনন্দ সৃষ্টির পন্থা বিভিন্ন। তাই রূপভেদ সত্ত্বেও দুই-ই অভেদ, দুই-ই কাব্য।

॥ ২ ॥

বাউল গুণময় মায়ার উপান্তে বিজ্ঞান-উত্তর যুগের সান্ধ্যকাব্য। কিন্তু সংসারসম্বন্ধ অথবা আত্মসম্বন্ধ ভাবে রচিত নয়, অধিদৈবভাবে সৃষ্ট। বাউলগান তাই অধিভূত-ভাবের উর্ধ্বে অবস্থিত আধ্যাত্মিক কাব্যের সঙ্গে সমস্তরবর্তী হলেও আধ্যাত্মিক কাব্য নয়, পরন্তু আধিদৈবিক কাব্য। এখানেই অন্য কাব্যের সঙ্গে তুলনায় এর ভাবগত ও রূপগত পার্থক্য। এখানেই বাউল গানের বৈশিষ্ট্য।

বাউল আধিদৈবিক কাব্য

গুণময় মায়ার সংসারের উপান্তে জ্ঞানময় অবস্থায় উত্তরণের ফলে বাউল মোহমুক্ত, শান্তদৃষ্টি। সংসার-স্বরূপ বিজ্ঞাত হওয়ায় সংসারের প্রতি সে আসক্তিহীন। বাউলগান এই ব্রাহ্মীস্থিতি[১] অবস্থায় রচিত। প্রথমেই বলা হয়েছে এ গানের উপাশ্রয় অধিদৈব ভাব। সেই কারণে এ গানের উপজীব্য তত্ত্বার্থের দ্বারা অজ্ঞানময় ভাবের নিরসন। স্বরূপজ্ঞান এর ভিত্তি, সেই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অস্বরূপের নির্দেশদানই এর কাজ। বাউল রচনা তাই নেতিমূলক। জীবন ও জগতের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা অর্থাৎ এর ক্ষণিকতা ও ক্ষয়িষ্ণুতা এর আলোচ্য বিষয়।

সাধারণ আত্মভাবে রচিত আধ্যাত্মিক কাব্যের ন্যায় এতে শুদ্ধ আত্মার ধ্যান নেই। স্বরূপ জ্ঞানের কথা থাকলেও অস্বরূপের কথাও আছে তার সঙ্গে। এই দ্বৈধ বাউল গানের বৈশিষ্ট্য। একদিকে সে সত্যের কথা বলে, অন্য দিকে অসত্যের সমালোচনা করে। আধ্যাত্মিক কবির ন্যায় সংসারের প্রতি নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত, নিরীক্ষণ এবং তজ্জনিত আনন্দবোধ তার নেই। সে দৃষ্টি অন্যদিকে স্থাপিত—যেদিকে পরলোক। বাউলের ভাবনা প্রাক্‌নির্বাণপর্বে

---

১ এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥৭২। —২য় অধ্যায়, গীতা

দাঁড়িয়ে অনাগত ও অনধিগতের ভাবনা। এই অনধিগত বাইরেও নয়, দূরেও নয়! অতি নৈকট্য সত্ত্বেও যে অপ্রাপ্তি তার কথাই প্রকাশিত হয়েছে বাউলগানে। বাউলগান এই অনাগত অনধিগতের ধ্যান, অদৃষ্ট-সত্তার স্মরণ, যে সর্বমানবাতীত ও সর্বকালাতীত মহিমময় পরমপুরুষ জীবের পরমগতি, চরম আনন্দ। বাউল একেই বলেছে 'মনের মানুষ'। এরই সন্ধানের কথা বাউলগানের মূল কথা।—

মনের মানুষ

'আমি কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।
লাগি সেই হৃদয় শশী
সদা প্রাণ হয় উদাসী
পেলে মন হতো খুশী
দেখতাম নয়ন ভরে।
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে
নিভাই কেমন করে
মরি হায় হায় হায় রে
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
দেখনা তোরা হৃদয় চিরে।
দিব তার তুলনা কি
যার প্রেমে জগৎ সুখী
হেরিলে জুড়ায় আঁখি
সামান্যে কি দেখতে পারে তারে।
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে
ছাই দিয়ে সংসারে।'[১]

[১] গগন বাউল রচিত, 'হিবার্ট' বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ধৃত।

অতি কাছে থেকেও যে দূরত্ব তার কথা বাউল কবি বলেছে নানাভাবে—

'দেখনা আপনারি ঘর ঠাউরিয়ে
ওসে আঁখির কোনায় পাখীর বাসা
যায় আসে হাতের কাছ দিয়ে।'[১]

কিংবা,

'সকল জীবের ঘটে আছে
মানুষ বস্তু একজনা
সর্পের মাথায় মণি থাকে
সর্প তাহা জানে না।'[২]

বাউল বলেছে—

'এই মানুষেই সেই মানুষ আছে'

তথাপি তার সাক্ষাৎ সহজ নয়। অন্তরতম পরমজনার এই যে বিরহ তার সংবেদ সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ লাভ করেছে পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত বাউল ফকীর লালন সাঁইয়ের[৩] গানে।—

আমি একদিনও দেখলাম না তারে
আমার আড়শী নগরে এক
পড়শী বসত করে।
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি
তার নাই কিনারা, নাই তরণী পারে।
মনে বাঞ্ছা করি দেখব তারে
আমি কেমনে সেথা যাইরে।

১, ২ নিজস্ব সংগ্রহ।

৩ নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী ভাঁড়ারা গ্রামে ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে জন্ম। শ্রেষ্ঠ বাউলগণের মধ্যে অন্যতম। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটে। রবীন্দ্ররচনার নানাস্থানে এঁর উল্লেখ আছে।

সে পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
সব যাতনা দূরে যেতো
সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।'[১]

'একখানে' থেকেও লক্ষযোজন ফাঁক হৃদয়ে গভীর অস্পৃহার সৃষ্টি করে।

তাই লালন বলেছে—

'কে কথা কয় রে
ও দেখা দেয় না।
হাতের কাছে নড়ে চড়ে
খুঁজলে জনম ভোর মিলে না।
খুঁজি আমি আশমান জমি
আমাকে না চিনি আমি
সে বড় ভূমের ভূমি
আমি কোন জন সে কোন জনা।
না জানি বাড়ীর খবর
মন চলছে দিল্লীর লহর
কাশিম কয় ওরে লালন
এখনও তোর ভ্রম গেলোনা।
কে কথা কয় রে,
ও দেখা দেয় না।'[২]

লালন সাঁইয়ের আর একটি গানের সামগ্রিক উদ্ধরণে বিরহ প্রসঙ্গ শেষ করি।

'কোথায় আছ দীন দরদী সাঁই
চেতন গুরুর সঙ্গ লয়ে
খবর কর ভাই।

১ নিজস্ব সংগ্রহ।
২ নিজস্ব সংগ্রহ।

চক্ষু আঁধার দেলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
কি রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই
বসে নিগম ঠাঁই।
এখনও না দেখলাম যারে
চিনবো তারে কেমন করে
ভাগ্যেতে আখেরে তারে
দেখতে যদি পাই।
সুমজে ভবে সাধন কর
নিকটে ধন পেতে পার[১]
লালন কয় নিজ মোকাম ঢোঁড়
বহুদূরে নাই ॥'[২]

বাউলের এ বিরহ অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন নয়, তা শুষ্ক, রুক্ষ, বিরলতার ভাবে পূর্ণ। এতে বেদনার চাঞ্চল্য নেই, আছে অচঞ্চল গভীরতা, অপ্রমত্ত গাম্ভীর্য। অনাগতের জন্য আস্পৃহা ছাড়া বাউলগানে বিচিত্রভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে সন্ধ্যাক্ষণের উপলব্ধি। যেখানে জগতের স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। জগতে সুন্দরের আলো রসের কালোয় মিশে যায়, কিন্তু বিজ্ঞানী হৃদয়ে 'আপন ঘরের ডাক' আর পৌঁছায় না, অসীমের বাঁশীর সুরে শান্তসুন্দর সহজানন্দ লাভ ঘটে।

বাউলকবি পদ্মলোচন[৩] রচিত একটি গানে এই উপলব্ধির প্রকাশ কেমন সুন্দরভাবে ঘটেছে—

'আমার ডুবলো নয়ন রসের তিমিরে
কমল[৪] যে তার দল গুটালো
আঁধারের তীরে।

১ নিয়ড়ি বোহি দুর মা জাহী—চর্যাপদ
২ 'হারামণি'—মোহম্মদ মনসুরউদ্দীন সংগৃহীত ও সম্পাদিত
৩ মেদিনীপুরের গায়ক বাউল।
৪ কমল কুলিশ-মাঝেঁ ভইঅ মিঅলী—চর্যাপদ

গভীর কালোয় যমুনাতে
চলছে লহরী
—রসের লহরী
ও তার জলে ভাসে কানে আসে
রসের বাঁশরী
আমি বাইরে ছুটি বাউল হয়ে
সকল পাসরি।
ঘর ছাড়িয়ে কেঁদে মরি
ভাসাই কুম্ভ রসের নীরে
আমার ডুবলো নয়ন রসের তিমিরে।'

গুণময় মায়া অতিক্রমণান্তে কবি যখন আসে নূতনতর লোকে, তখনকার উপলব্ধি তার নিকটে বিচিত্র বলে মনে হয়। নদীর গতিধারা বহুদিন ধরে বহুদেশ ঘুরে অবশেষে যেন মোহনার নিকটবর্তী হয়েছে। অনাগতের ঈষৎ আভাসে তাই তার অন্তরে অপূর্ব সংবেদের সৃষ্টি—

'আমি মজেছি মনে
না জানি মন মজলো কিসে
আনন্দ কি মরণে।
ওরে আমায় এখন ডাকা মিছে
নাই যে হিসাব আগে পিছে
আনন্দে মন নেচে ওঠে
তার নূপুর বাজে রাত্রে দিনে।
কই সে সাগর কই এ নদী
তবু চলছে খবর নিরবধি
আজব রঙ্গ দেখবি যদি
মিলা নয়ন হৃদয় সনে।'

অদূরবর্তী মহাসাগরের কল্লোলধ্বনি অত্যন্ত স্পষ্ট শ্রুত হয়। তার অভ্রান্ত, অনিবার্য, নিগূঢ় নীরব আহ্বানের প্রচণ্ড শক্তি স্ফুটতর

ভাবে অনুভূত হয়। পরমপুরুষ সেই 'মনের মানুষের' আকর্ষণ প্রবল এবং প্রচণ্ড। সেই প্রচণ্ডতা বাউল গানে বিবৃত হয়েছে—

'ওগো দরদী আমার মন কেন উদাসী হতে চায়
তার ডাক নাহি হাঁক নাহি গো
আপনে আপনে চলে যায়।
ধৈরজ না ধরে অন্তরে
মন শিহরে নয়ন পরে
সে নীরব সে রবে সদা
বলে আয় গো আয়।
ভাঁটী সোঁতে ভাঁটারি গড়ান
সাগর যেমন সদা টানে
নদীর পরাণ
সে টান এতই প্রবল
মনের গরল অমৃত হইয়ে যায়।
কেমন করে দেয় গো মন্ত্রণা
উড়ায়ে দেয় মনের পাখী
মানা মানে না।
উড়ে যায় বিমানের পানে
শীতল বাতাস লাগে গায়।'

জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল নদীমুখে প্রবেশ ক'রে উচ্ছ্বসিত, উচ্ছলিত, ফেনিল প্রবাহে তাকে স্ফীত, তরঙ্গিত, আলোড়িত করে। তেমনি মায়াগ্রস্ত আত্মাও এই উজান পথে অহঙ্কারে স্ফীত হয়, ভবনদী উত্তাল তরঙ্গনৃত্যে আবর্তবহুল, ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। কিন্তু ভাঁটার সময় যেমন আবার নদীর হৃদয় থেকে সমস্ত রস সাগর টেনে নেয়, তেমনি জীবনের ভাঁটিপথে দাঁড়িয়ে ভাঁটার স্রোতে সংসারের সকল রস ঘুচে যায়। চর্যায় একেই বলা হয়েছে—

'দুহিল দুধু কি বেণ্টে সমাঅ'

মায়াগ্রস্ত অহঙ্কারী ব্যক্তি জাগতিক যে বস্তুতে উগ্র লালসা

ও ভোগাকাঙ্ক্ষায় আসক্ত হয়, সেই বস্তুই গুণময় মায়ামুক্তির পর নিতান্তই অসার ও অকিঞ্চিৎকর বলে প্রতীয়মান হয়। যে বস্তুকে প্রাক্‌বিজ্ঞান যুগে নিতান্তই প্রয়োজনীয় মনে হয়, বিজ্ঞানোত্তর কালে তাই একান্ত অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। মোহগ্রস্ত ও মায়াবিজ্ঞানীর ভাবনা পরস্পর বিরোধী। একের যা অপরিহার্য, অন্যের তাই তুচ্ছাতিতুচ্ছ, একের যেখানে আকুল আগ্রহ, অন্যের সেখানেই অলস ঔদাসীন্য। এক যেখানে তৎপর, অন্য সেখানেই নিরাসক্ত, উদাসী। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবটিকে একটি বিখ্যাত শ্লোকে বিবৃত করেছেন—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

৬৯।২য় অধ্যায়

জীবের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তনটি বাউল কবি প্রাগুক্ত গানে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে। এই হ'ল ভাঁটি স্রোতে ভাঁটার গড়ান। মোহের আবরণ এখানে দীর্ণ হয়েছে, নিদ্রিত এখানে জাগ্রত। এ সেই জাগা 'যে জাগায় ঘোচে ধরার মনের কালি'। এই ভাঁটি স্রোতের কথা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পাই।—

'ওগো সন্ধ্যা শেষ প্রহরের নেয়ে
ভাসাও খেয়া ভাঁটার গঙ্গা বেয়ে
পৌঁছিয়ে দাও কূলে
যেথায় আছো অতি কাছের
দুয়ারখানি খুলে।'

এ অবস্থায় জীব বাউলকবির ভাষায়—

'উড়ে যায় বিমানের পানে
শীতল বাতাস লাগে গায়।'

বস্তুত এই বিমান বা আকাশ মানুষেরই মধ্যে। এই সাগর তারই অন্তরে। তাই বাউল বলেছে—

'তোরই ভিতর অতল সাগর'

কিংবা

'মনের মধ্যে মনের মানুষ
করো অন্বেষণ।'

বাউলগানে আত্মার ধ্যান, কিন্তু ইহলোক-প্রসঙ্গত নয়। পরন্তু ক্ষয়িষ্ণু ইহলোকের সম্বন্ধে অনিত্যতাবোধ এর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

নেতিবাদ

পার্থিব প্রসঙ্গে এ সাহিত্য নেতিবাচক। এখানে উপনিষৎ প্রভৃতির সঙ্গে এর সাধর্ম্য। আনন্দঘন পরমপুরুষ, বাউলের যে 'মনের মানুষ' তার দিকে দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে সে শুধু জগৎ সম্বন্ধে 'হেথা নয়, হেথা নয়, ইহা নয়, ইহা নয়' ভাবে নিরসনবাদী। বাউলগানে এই নেতির প্রাধান্য ও প্রাচুর্য লক্ষনীয়।

কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের[১] একটি গান উদ্ধৃত ক'রে এ উক্তির যথার্থতা প্রত্যক্ষ করা যাক—

'ও ভোলা মন
ত্যজিয়ে আসল যে ধন কেন রে মন
সুদের কারণ টানাটানি।
আসলে ত্যাজ্য করে সুদকে ধরে
বড় মূর্খ সেই তো জানি।
সুদকে ত্যাজ্য করো, আসল ধরো
থাকিবে ঠিক মহাজনী।
জানোনা আসল হতে এ জগতে
যতো সুদের আমদানী।
তবে কেন আসল ত্যজ, সুদকে ভজ
বেড়াও করে পাগলামি।

১ লালনসাঁইয়ের সমসাময়িক এবং সুহৃদ। প্রতিবেশীও বলা যায়। কারণ কুমারখালি এবং কুষ্টিয়া পার্শ্ববর্তী স্থান। এঁকে অনেকে নকল বাউলদের দলে ফেলেন। কিন্তু এঁর রচনায় যে গভীর উপলব্ধি ও সুরের প্রকাশ আছে, তাতে রচনার খাঁটিত্বে সংশয়ের অবকাশ নেই।

গোপনে সযতনে, আসল ধনে
রাখে যে সেই আসল ধনী,
আসলে সুদের কড়ি ডালখিচুড়ী
মিশালে হয় বলে জ্ঞানী।
সাগরেদ ফিকিরচাঁদ বলে, আসল পেলে,
ভবজ্বালা ঘোচে জানি
আমি সেই আসলধনে নাহি চিনে
করতে চাই মহাজনী।'
ও ভোলা মন॥

আর একজন বাউলকবি পদ্মলোচনের একটি গান—

'ও গুণী কওনা শুনি কোন গুণে মানব হয়েছো
তোমার পিতৃধনের বিনাশ ক'রে
রতি মধ্যিখানে হারিয়ে আছো।
তোমার নাই দরজায় আসল তালা
তুমি কোন দ্বারে চাবি হেনেছো।
তোমার রোজার গাঁয়ে তৌশিলদারী
কেবল ভাঙ্গা গাঁয়ে মোড়ল সেজেছো।
তোমার মন্দিরেতে নাই যে মাধব
কেবল শাঁখ ফুঁকে হায় গোল করেছো।
তোমার আসল দ্বারে নাই যে আগল
কেবল ঢেঁকশালে চাঁদোয়া টানিয়েছো।
তাই বলে পদ্মলোচন কেবল ভগ্নদশা হয়ে আছো
তুমি কি ভাণ্ডে কি ব্রহ্মাণ্ডে আছো
কোন ভাণ্ডের খবর রেখেছো।"

প্রাগুক্ত গানে যেমন, গৌরদাসের গানেও তেমনি সহজ উপমার মাধ্যমে সংসারভাবের নিরসন-প্রয়াস—

'মনরে তুই বিষম কাণা গেলো জানা
সুধা ফেলে গরল খেলি।

হলি ইত নষ্ট তত ভ্রষ্ট

এ কূল ও কূল সব খোয়ালি।

পেয়ে এই পরশমণি রত্নখানি

যতন করে না রাখিলি।

কি বলে সোনা ফেলে অবহেলে

আঁচলে কাঁচ বেঁধে নিলি।

ভাবো না দিবানিশি ঘরে বসি

মন-মাঝে বনমালী।

গৌরের এই ভাবনা পাছে কানা

বিষয় বনে করে কেলি।

সাধের মিনতি যত হবে হত

রবে ভূমে সকল ভুলি।'

ভনিতাবিহীন, অতিসংক্ষিপ্ত অথচ অতি সুন্দর একটি গান উদ্ধৃত করি—

'গুরু গো আমার পূর্বের কথা মনে নাই

আমি জানতে এলেম তাই

পূর্বের কথা মনে হলে ভাসি দুই নয়ন জলে

আর কি আছে কপালে দিবানিশি ভাবি তাই।

নাক থাকতে নিশ্বাস বন্ধ, মুখ থাকতে বাক্য বন্ধ

চোখ থাকতে হলেম অন্ধ

মনে মনে ভাবি তাই।'

কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের বা ক্ষেপাচাঁদের রচিত আর একটি নেতিমূলক সঙ্গীত উপসংহারে উদ্ধৃত করি।—

'আসিয়ে কিনিতে সোনা ওরে কানা

কিনলি কিনা রাং তামা-কে

ভবের মাঝে এসে লাগলো দিশে

ঘুচবে কিসে বল আমাকে।

দরদী হবে যে জন বুঝবে সেজন
অন্যে কে বা চিনবে তাকে।
না হলে ভাবের ভাবি ভাবের হাটে
গোল মেটে কি ভূয়ো জাঁকে।
কাঙ্গাল ক্ষেপাচাঁদ বলে ফাঁকা লাভের তরে
ভাবের ঘরে পড়লি ফাঁকে।'

এই নেতিবাদ পাঠকচিত্তে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, সে প্রসঙ্গের এবং নেতিবাচকতার আরও নূতন প্রসঙ্গের আলোচনায় অনতিবিলম্বে আবার আসছি।

॥ ৩ ॥

আধিদৈবিক কাব্যের সাধারণ নিয়মেই বাউলগান একভাবপ্রধান। সেই কারণেই বিভিন্ন পাঠক বা শ্রোতা আপন আপন সংস্কারানুযায়ী তার বিচিত্র অর্থ সৃষ্টিতে সমর্থ হয় না। এ কাব্য একমুখী। অর্থ-বহুলত্বের সম্ভাবনা এখানে লুপ্ত। অর্থ এখানে এক এবং অদ্বিতীয়। দ্বিতীয়-রহিত সেই অর্থ পাঠকজনের চিত্তে সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য না হতে পারে এবং তা না হওয়াই স্বাভাবিক, তথাপি তার আভাস সকলেই লাভ করে। কী ভাবে, সে কথার আলোচনা কিছু পরেই হবে। কর্মভাবের কথা পাঠকচিত্তে বিভিন্ন সংবেদের সৃষ্টি করে, তাই প্রতিক্রিয়া-বৈচিত্র্যে অর্থ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। বাউলগানে কর্ম-ভাবের কথা নেই, এর উপজীব্য সত্যাসত্যের বিবৃতি। তাই বাউলকবি যখন বলে—

একভাব

'আমি কি সন্ধানে যাই সেখানে
আমার মনেরই মানুষ যেখানে
অন্ধকারে জ্বলছে বাতি
দিবারাত্রি নাই সেখানে।'

তখন ভিন্নার্থের সম্ভাবনা থাকে না। পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত বাউল লালন সাঁইয়ের একটি গান নেওয়া যাক।

'আমার ঘরের চাবি পরেরই হাতে
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখবো চক্ষেতে।
আপন ঘরে বোঝাই সোনা
পরে করে লেনা দেনা,
আমি হলেম জন্ম-কানা
না পাই দেখিতে।
রাজী হলে দরোয়ানী
দ্বার ছাড়িয়ে দিবেন তিনি
তারে বা কৈ চিনি শুনি
বেড়াই কুপথে।
এই মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষ রতন
লালন বলে পেয়ে সে ধন
পারলাম না চিনতে।'

আর একটি গান। রচয়িতা ফিকিরচাঁদ—

'হাওয়ায় আসা হাওয়ায় যাওয়া
হাওয়ায় খবর কেউ করলে না
বারমাসের এ কারখানা মনের মানুষ কেউ চিনলে না।
ফিকিরচাঁদ দরবেশে বলে, হাওয়া ধরা গেলো নারে
যদি কেহ ধরতে পারে, আপনারি শক্তি জোরে।"

তত্ত্বমূলক

একভাব-প্রাধান্যের জন্যই এ কাব্যকে রসমূলক না বলে তত্ত্বমূলক বলা সঙ্গত। তবে এখানে একটু কথা আছে। বাউলকবির আত্মিক উন্নতির সমস্তরে যিনি উত্তীর্ণ, তিনি এ রচনার সম্যক আনন্দানুভবে সমর্থ। তাঁর কাছে এ বাণী শুধু তত্ত্বমূলক নয়। কারণ এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি তাঁর সম্যক উপলব্ধির বিষয়। এর অর্থটি আর তাঁর নিকট অপরিস্ফুট আভাসমাত্র নয়। পরন্তু একান্ত

পরিস্ফুট ও প্রত্যক্ষ। তাই কাব্যপাঠে তাঁর চিত্ত বাউলের সঙ্গে সম আনন্দের ভাগী হবে।

কিছুপূর্বে বাউলগানের নেতিমূলকতার যে অসমাপ্ত আলোচনা করা হয়েছিল, এখানে তার সমাপ্তি করি। পূর্বে বলা হয়েছে অশাশ্বত জগতের অনিত্যতা বর্ণনা বাউলের বৈশিষ্ট্য। এই অনিত্যতা বিবৃতি শুধু জগতের নয়, পরন্তু মানুষের অহঙ্কারের। কর্মে কর্তৃত্বারোপ ও কর্তৃত্বাভিমান যে ভ্রান্তিমাত্র এবং বিচিত্র দুঃখের উৎস, একথা গানে বার বার বলা হয়েছে। এই অভিমানরূপ অজ্ঞানময় ভাবের নিরসন এর উপজীব্য। প্রকৃতিদ্বারা অবশতাপ্রাপ্ত হয়ে মানুষ কর্মে লিপ্ত হয়। কিন্তু মায়াগ্রস্ত হয়ে ভাবে সে-ই সমস্ত কর্মের নিয়ামক, সকল কার্যের নিয়ন্তা। মোহাচ্ছন্ন জীব 'কর্তা-হমিতি মন্যতে',—ভাবে 'আমি কর্তা'। এই অভিমান দুঃখকর। কারণ জীবনের পথে প্রাগ্রসর জীবের প্রতি-পদক্ষেপেই এ অভিমানে আঘাত লাগে। কর্তৃত্বের ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হয় পদে পদে। বাউলগানে মানুষের এই অজ্ঞানময়তার প্রতি অঙ্গুলি-সঙ্কেত।

আমি আমার করিস রে মন
আমি কে তোর তাই চিনলি না
ও তোর ব্যর্থ হলো কর্তাগিরি
তবু কেন হার মানলি না।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে
ভূতের বোঝা মরলি বয়ে
ওরে হাল ছেড়ে পাল তুললে পরে
মুক্ত রবি তাও জানলি না।

এই হাল ধরে থাকার মূলে জীবের 'আমি' সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক ধারণা। এর কথাই বাউল বলেছে—

'আমি' 'আমার' 'ক্ষেত্র' : 'ক্ষেত্রজ্ঞ'

আমি কে তাই আমি জানলেম না
আমি আমি করি কিন্তু
'আমি' 'আমার' ঠিক রইলো না।
কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি
চার কড়ায় এক গণ্ডা গণি
কোথা হতে এলাম আমি, তারে কই গণি ॥

লালন সাঁইয়ের একটি গানে পাই—

আপনাকে আপনে যে জন জানে
আপন আত্মাকে দেখেছে নয়নে।
সবে বলে 'আমি আমি' 'আমি' কে তা
কেউ জানে না।
লালন বলে আমার এ আমি
সর্বসাধন গুরুর চরণে
ও মন আপনাকে যে চিনেছে
নিগূঢ় তত্ত্ব সেই পেয়েছে
সেজন নিগমে বসে আগম ধরে টানে।

জীবের বিড়ম্বনা এই 'আমি' নিয়ে। অজ্ঞানময় অবস্থায় জীব অহঙ্কার, দেহ, বুদ্ধি, ইচ্ছাতেই 'আমিত্ব' আরোপ করে। এটি ভ্রম। 'ক্ষেত্র' 'ক্ষেত্রজ্ঞ', 'দেহ' 'দেহী'র পার্থক্য-বিস্মৃতিই ভ্রমের মূলে। 'ক্ষেত্র'কে 'আমার' না ভেবে 'আমি' ভাবাই ভ্রান্তি। এরই ফলে বন্ধন ও দুঃখ। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥২।
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম ॥৩।

১৩শ অধ্যায়

'আমি' 'আমার' ঠিক না থাকাতেই কর্মে কর্তৃত্বাভিমান দেখা দেয়। 'অহং কর্তা' এই বোধ নিয়ে মানুষ অহঙ্কারের ধ্বজাবাহী

হয়। অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে প্রত্যেকেই আপন মতকে ঠিক, আপন নীতিকে নির্ভুল, আপন আদর্শকে চরম এবং আপন দৃষ্টিকে অভ্রান্ত বলে মনে করে।[১] যদিও অহঙ্কারীর দৃষ্টিমাত্রই ভ্রান্ত এবং একদেশদর্শী। তাই বাউলকবি তার গ্রাম্যভাষায় সহজ ছাঁদে সরলভাবে বলেছে—

'যত সব কানার হাটবাজার।
পণ্ডিত কানা অহঙ্কারে
সাধু কানা অভিচারে
হায়রে কানায় কানায় যুক্তি করে
যেতে চায় রে ভবের পার॥
কেউ বা হয়ে দিনে কানা
পরের দোষে দিচ্ছে হানা
রাতকানা কেউ শুয়ে শুয়ে
ঘুমের ঘোরে দেয় বাহার॥
কানায় বলে ওরে কানা
আমার পথে চলে আয় না
আচ্ছা মরি বাবুয়ানা
তোর পথে কি আছে সার॥
যত সব কানার হাটবাজার।'[২]

তত্ত্বার্থ দিয়ে অজ্ঞানময় ভাবের এই নিরসনের নিষেধাত্মক উক্তি বাউল গানকে করেছে শিক্ষামূলক। কথাটি আরও একটু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। বাউল কর্মে আমিত্ব আরোপ অথবা কর্মে কর্তৃত্ব আরোপের অসারতাকে বিবৃত করে। সাধারণ মানুষমাত্রেরই

১ সবাই ভাবে আমার ঘড়ি ঠিক চলছে —শ্রীরামকৃষ্ণ

২ মনোমোহন সাধু বিরচিত। বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ মহাশয়ের কণ্ঠে শ্রুত।

জীবনে এই ভ্রান্তি দেখা দেয়। এজন্য দুঃখভোগও ঘটে। কারণ বিফলতা মানুষমাত্রেরই জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। কর্মলিপ্ত মানুষ কার্যকালে 'অহংকর্তা' এই বোধ নিয়ে অগ্রসর হয় এবং ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে অন্তরে। তার সব কাজই উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঘটে অন্যরকম। প্রচেষ্টার পরিণামে অভীপ্সিত ফল দেখা দেয় না। এক করতে আর হয়ে যায়। শক্তির এই ব্যর্থতা তখন তার শক্তিতে বিশ্বাসকেও আঘাত করে। সমস্ত ব্যাপারটি তার কাছে রহস্যজনক বলে মনে হয়। শুধু স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ বিফলতা নয়, তার তথাকথিত সফলতাও বিফলতাকেই প্রমাণিত করে। আনন্দের সন্ধানে সে কর্ম করে, খণ্ডকে মুঠোর মধ্যে পেতে চায়। কর্ম কৃত হয়, খণ্ডও মুষ্টিগত হয়, কিন্তু আনন্দ অনধিগত থাকে। আনন্দের জন্য বস্তুকে কামনা করে, বস্তু আসে কিন্তু আনন্দ মেলে না। শ্রান্তিই সার হয়।

শিক্ষামূলক

এ হেন অবস্থায় সবটাই তার কাছে দুর্বোধ্য বলে প্রতীয়মান হয়। এই দুর্বোধ রহস্যের কথাই বাউলগানের উপজীব্য। তাই এ গানে প্রাণ আকৃষ্ট হয় সহজে। শ্রোতা গানে একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতার বিবৃতি শোনে এবং তার অর্থ পায়। এখানেই শিক্ষা। বহির্বিষয়ে যে আনন্দ নেই, সেই আনন্দকেই যখন মানুষ বাহিরে খোঁজে, যখন—

'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম'

এমনিতর ভাব দেখা দেয়, এবং বিধাতার দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মে ব্যর্থতা ও হতাশা উপস্থিত হয়, তখন বাউলের বাণী যে শিক্ষা দেয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা হ'ল—

'ছিন্নমালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাস না কো কুড়াতে'।

বলাবাহুল্য এ শিক্ষা কর্মত্যাগের শিক্ষা নয়, কর্মে কর্তৃত্বারোপ

ত্যাগের শিক্ষা, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জনের শিক্ষা। কার্যকালে যা দুর্বোধ, রহস্যময় বলে প্রতীয়মান হয়, বাউল তাকেই সহজ ও সরল ক'রে বুঝিয়ে দেয়।

এখন এই শিক্ষার স্বরূপটি ভালো ক'রে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

শিক্ষার স্বরূপ

শিক্ষাদান সাহিত্যের কাজ নয়। বাউলগানও পাঠকের অজ্ঞান দূর ক'রে শিক্ষা দিয়ে তার চারিত্রিক ও আত্মিক উন্নতির ভার নেয় নি। বাউলের মধ্যে আদৌ সে প্রচেষ্টা নেই। তেমনতর শিক্ষা সম্ভবও নয়।

বস্তুত এই শিক্ষা মানবমনের সুপ্তজ্ঞানের ক্ষণিক জাগরণ, চেতনার সাময়িক প্রকাশ। এর স্থায়িত্ব নেই। শৈবালাচ্ছন্ন জল যেমন বাতাসের সংস্পর্শে ক্ষণিকের জন্য অনাবৃত হয়, আবার শৈবালদল তাকে অনতিবিলম্বে ঢেকে ফেলে, এও তদনুরূপ। আবরণের বিনাশ নয়, ক্ষণিক উন্মোচন। সুতরাং শিক্ষার অর্থ এই নয় যে গান শ্রবণে আমরা বৈরাগী হয়ে গেলাম। উদাসী বাউল উদাসভাবেই সত্যের প্রকাশ করে, বৈরাগ্যের ওকালতী ক'রে মানুষকে বিরাগী করার প্রয়াস পায়না।[১] খাঁটি বাউলগান যে 'মৃত্যু-ভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগী দলে টানবার প্রচারকগিরি' নয়, তা রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন এবং বলেছেন 'লোকসাহিত্যে' এর আলোচনা প্রসঙ্গে। এ শিক্ষার চরম পরিণতি এবং পরম সার্থকতা কোথায় তার আলোচনাই এবার করব।

ক্ষণিক হলেও যদি শুধু শিক্ষাই বাউলের কাজ হ'ত, গানের বৈশিষ্ট্য যদি শুধু এখানে এসেই সীমিত ও সমাপ্ত হয়ে যেত, তবে বাউলকে আর যাই হোক 'সাহিত্য' নামে অভিহিত করা যেত না,

১ ডা: দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছেন—
'বাউল শুধুই মড়াকান্না গাহিয়া বিরাগ শিখায়।'
—এই উক্তি ভ্রান্তিমূলক।

এ গান অবশ্যই সাহিত্য নামের অযোগ্য হ'ত। এ পর্যন্ত যে বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত হয়েছে, শুধুমাত্র তার সঙ্গে কাব্য বা সাহিত্যের মস্ত ব্যবধান। কিন্তু মধ্যদেশের এই ব্যবধান সত্ত্বেও পরিণতির একটি বৈশিষ্ট্য বাউলকে সাহিত্য বা কাব্যস্তরে উন্নীত করেছে। উপায়ের এ পার্থক্য সত্ত্বেও সর্বশেষের একটি উপাদান একে কাব্যপদবাচ্য ক'রে তুলেছে। সেই পরিণামী উপাদান কী, এখন তাই আমাদের আলোচ্য।

জীবনের পথে মানুষ যখন আপন শক্তির অভাবিত পরাজয় এবং অপ্রত্যাশিত নিষ্ফলতার সম্মুখীন হয়, তখন তার অতিসচেতন আত্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে। অহঙ্কারের নিদারুণ অপমানজনিত ক্ষোভ ও দুঃখে সে একান্ত কাতর হয়। বাউলগানের শিক্ষা তার এই দুঃখে শান্তির প্রলেপ। আপন অতিপ্রত্যক্ষ শক্তির ত্রুটিহীন

শান্তি

ব্যবহারেও যখন অপ্রত্যক্ষ জগৎ থেকে স্বপ্নাতীত ব্যর্থতা দেখা দেয় এবং দুর্জ্ঞেয় রহস্যাবৃত প্রতিবেশে মানুষ যখন বিস্মিত, বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন বাউল তার সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত, উদ্রিক্ত ও উদ্বোধিত করে। সে শান্তি পায়। বাউলগান ব্যাহত-শক্তি, আহত-চিত্ত অহঙ্কারীর তাপদগ্ধ, পীড়িত-প্রাণে শান্তিজল, অশান্তের হৃদয়ে 'শান্তসুরের সান্ত্বনা'।[১]

গান শ্রবণে শ্রোতৃচিত্ত সাময়িকভাবেও শান্তরসের জগতে উত্তীর্ণ হয়। এ লোক আনন্দরসলোক। শান্তির অব্যবহিত ফল আনন্দ।

[১] এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের প্রতাপ ও ধনঞ্জয় চরিত্রের কথা স্মরণীয়। প্রতাপ অহঙ্কারের মূর্ত প্রতীক। কিন্তু ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান তার প্রাণকে আকর্ষণ করে। তাই প্রতাপের মুখেও একথা উচ্চারিত হয়—'বৈরাগী, আমার এক একবার মনে হয় তোমার ওই রাস্তাই ভালো, আমার রাজ্যটা কিছু নয়।' একথা প্রতাপের মনের কথা নয়, প্রাণের কথা।

এখানেই বাউল গানের কাব্যত্ব। সাধারণ কাব্যের ন্যায় এখানে আনন্দের প্রত্যক্ষ প্রকাশ নেই, রসের উল্লাস নেই। কিন্তু পরিণামে পাঠক বা শ্রোতৃহৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। হয়, তার কারণ এ গানে প্রশ্নরত আমির উত্তর নিহিত। কাব্যের উপজীব্য আনন্দ নয়, উপজীব্যের ফল বা প্রতিক্রিয়া আনন্দ। অর্থাৎ বাউলগানে আনন্দেরই অভিব্যক্তি নেই, আনন্দের সুর আছে। বাউল আনন্দকেই প্রকাশ করে নি, কিন্তু গান শ্রবণে আনন্দের সঞ্চারণ ঘটে হৃদয়ে। তাই বাউলগান কাব্য।

পরিণামী উপাদান : আনন্দ

তবেই দেখা গেল, সাধারণ কাব্যের সঙ্গে আনন্দ প্রকাশ ব্যাপারে বিরাট ব্যবধান বা পার্থক্য সত্ত্বেও বাউলগানের পরিণামে আনন্দ প্রতিক্রিয়ারূপে এসে একে কাব্যশ্রেণীতে উন্নীত করেছে। পাঠকচিত্তে তাই এর আকর্ষণ অনুভূত হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বাউল কাব্যের একটু বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য আছে। কর্মে কর্তৃত্বের বিফলতাকে, মানুষের অহঙ্কারের ব্যর্থতাকে বিবৃত করে বলেই একাব্য সর্বত্র সর্বকালিক (সর্ব অবস্থায় আনন্দপ্রদ) নয়। কারণ এর শিক্ষা, শান্তি তথা আনন্দলাভ ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। ব্যাহতশক্তির অভিজ্ঞতা-জনিত ক্ষোভ যেখানে নেই, সেখানে এ গানের আনন্দের সুরও সম্যক বাজে না। কিন্তু এ গান সর্বজনীন। কারণ জীবনে অহং শক্তির ব্যর্থতা সর্বজনীন অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। তাই সর্বজনচিত্ত এ গানের সুরে নন্দিত হবেই। বাউল যখন বলে—

সর্বকালিকতা ক্ষুণ্ন

'আমি আমার চিনলি না মন
রইলি বসে।'

তখন সর্বজনচিত্তে এর সাড়া জাগে।

কেন, তা আরও একটু ব্যাখ্যামূলকভাবে আলোচনা করি। বস্তুত বাউল মোহমুক্ত ; তার গান জীবনমুক্তের বাণী। অপরপক্ষে

প্রাকৃত জনসাধারণ মায়াময় পার্থিব পরিবেশের মুগ্ধ অজ্ঞানময় ভাবের ভাবী। অহঙ্কার তার মজ্জায় মজ্জায়। যা পদে পদে জীবনকে বিড়ম্বিত করে সেই শক্তির ব্যর্থতায়ও সে অহঙ্কার বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। কিংবা কর্মে কর্তৃত্বারোপের প্রচণ্ড ইচ্ছা নষ্ট হয় না। সুতরাং নিত্যনৈমিত্তিক সংসারের ভাবনার সঙ্গে বাউলের চেতনার মিল নেই। এখন প্রশ্ন এই যে তথাপি বাউলগান ভালো লাগে কেন। গান শ্রবণে সংসারী কেন বলে না—

'এ একটি বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর কথা, এ অভিজ্ঞতা অল্পলোকের মধ্যে বদ্ধ, আমি এর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ অনুভব করি না।' কেন বলে না—'তাতে আমার কী'। এর উত্তর নিহিত রয়েছে বাউলগানের নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে—তার সুরে।

কবি চণ্ডীদাস এক জায়গায় বলেছেন—

'সে দেশের কথা এ দেশে বলিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা'।

সংসারের রসিক মুগ্ধজন সংসারের মাহাত্ম্যকীর্তনে নন্দিত হতে পারে, কিন্তু সংসার ভাব-বিরোধী উক্তি তার কাছে নীরস ও বিরস হবে। এটাই স্বাভাবিক, কেন না সে কথায় তার অন্তরের সায় নেই। কিন্তু বাউল যখন গানের মাধ্যমে সে দেশের কথাই বলে, তখন এদেশের লোকের মরমে ব্যথা লাগে না। উপরন্তু সে আনন্দিত হয় কেন? কারণ এ বলা শুষ্ক, নীরস গদ্যে বিরস নীতি উপদেশ নয়, সুরের ঝঙ্কারে সত্যের অভিব্যক্তি। তাই এখানে 'সে দেশের কথা এদেশে' প্রবাসীর কাছে স্বদেশের সংবাদের মতো।

পূর্বে বলা হয়েছে শিক্ষার অব্যবহিত ফল আনন্দ। নীতি কথাও শিক্ষাদানের প্রয়াস পায়। কিন্তু সে শিক্ষায় আনন্দ নেই, শুষ্ক নীতি শুধু জানায়, অনুভব করায় না। তাই তাতে অন্তরের যোগ স্থাপিত হয় না। কিন্তু বাউলগানে যে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, তা সেই নীতিশিক্ষা মাত্র নয়। এখানে সুরবাহন সত্যের

যাত্রা। তাই অন্তরলোকে তার গতি বাধাহীন। এই যোগ 'ব্যক্তিগত নয়, সত্যগত'।[১] এর মূলে রয়েছে সুর।

এবার বাউলগানের প্রাণপাখী যে সুরের কৌটায়, তারই স্বরূপটি আলোচনা করা যাক।

বাউলগান যে শ্রোতার হৃদয়ে আনন্দের উদ্বোধন ঘটায়, তার প্রধানতম কারণ এর সুর। বাউলকবি বলেছে—

'আমরা পাখীর জাত
গান আমরা হেঁটে চলার ভাও জানি নে
আমাদের উড়ে চলাই ধাত।'

পাখী যেমন পাখা মেলে উড়ে চলে, এখানেও তেমনি উড়ে চলা, সুরের পাখা মেলে। গানে সুরের পক্ষবিস্তার।

সুরময় বাণীই গান বা সঙ্গীত। তাই বাউল বলে, গানই তার ভাষা। বাউল গুণময়মায়ামুক্ত পুরুষ। জীবনমুক্তের ভাবনার প্রকাশ গানে[২]। প্রকাশের এই তো মাধ্যম। গানের ভাষা ছাড়া গতি কোথায়?[৩] গানের তান সুরের ডানা মেলে উড়ে চলে অনন্তের আকাশে।

সুরের স্বরূপ কেমন? প্রথমেই বলে নি, এই যে সুর, এ বাহিরের আরোপিত গেয় সুর নয়, পরন্তু বাণীর অন্তর থেকে উৎসারিত সূক্ষ্মতর, গভীরতর সুর। গানের শুদ্ধ বাণীরূপের নিজস্ব সুর।

গেয় সুর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ এ গুরুত্বহীন। কাব্যের সঙ্গে এর যোগ ততখানি নিবিড় ও অঙ্গাঙ্গী

---

১ রবীন্দ্রনাথ

২ মুক্ত যে ভাবনা মোর ওড়ে উর্ধ্বপানে
সেই এসে বসে মোর গানে — স্ফুলিঙ্গ

৩ গভীর হতে বিচ্ছুরিত আনন্দময় দ্যুতি
শুধু কেবল গানেই ভাষা যার… অমর্ত, সেঁজুতি, রবীন্দ্রনাথ

সুরের বাহন সেই পর্দার আড়ালে সত্যলোকে আমাদের নিয়ে যায়, সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না। —রবীন্দ্রনাথ

নয়। গেয় সুর আন্তর সুরের অনুসারী। তথাপি এর মূল্য খুব বেশী নয়। কারণ এর পরিপূর্ণ সর্বজনীন রূপ নেই। ব্যক্তিবিশেষের নিকটে এ রূপবিশেষ লাভ করে। তাই একদিক থেকে অর্থাৎ ব্যক্তির কাছে এর মূল্য থাকলেও বস্তুত মূল্য খুব বেশি নয়। কারণ পাত্রভেদে গেয় সুরের বিভিন্নতা ঘটে। তবে একথাও সত্য, লোক সঙ্গীতের সুর নানা কণ্ঠে নানাভাবে রূপান্তরিত হলেও তার ঐক্যটি বা বিশিষ্টতাটি একেবারে ক্ষুণ্ণ হয় না। বাউলের গেয় সুরে একটি সহজ বিশিষ্টতা আছে। তার মধ্যে তানের বৈচিত্র্য নেই, আতিশয্যও নেই। মীড় নেই, শুধু ছোট ছোট সুরের অলঙ্কারযুক্ত। স্বর একটানা, কাটা কাটা নয় বা লাফিয়ে চলে না। কোনো অনাবশ্যক বাহুল্য এর রসভঙ্গ করেনি। শুধু আন্তর সুরের লয়ানুসারে একতারার সাহচর্যে সহজ আন্দোলনে গাতার কণ্ঠে স্বর আন্দোলিত হয়। সে সুরের দরদটুকু প্রাণকে স্পর্শ করে। উদার আকাশের নীচে উন্মুক্ত প্রান্তরে উদাত্ত কণ্ঠের উদাসী বাউল সুর শ্রোতামাত্রেরই 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ ক'রে মনকে উদাস করে তোলে। এ গানের মধ্যে আছে বেদনা, কিন্তু সে বেদনার অন্তরে আছে আনন্দ। বাউলের সুরের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে, বিশিষ্ট স্থানও আছে। এর সরল, অনাড়ম্বর, সহজ সুর রবীন্দ্রনাথকেও আকৃষ্ট করেছে এবং তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপে সচেতন ও অসচেতনভাবে এ গানের সুর আপনার সৃষ্টির ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন[১]

গেয় সুর

---

[১] আমার অনেক গানে আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি, এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে বাউল-সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে বাউলের সুর সহজ হয়ে মিশে গেছে। —রবীন্দ্রনাথ

এ (বাউল) গানের নিখুঁত সুররূপ রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। —রবীন্দ্রসঙ্গীত, শান্তিদেব ঘোষ

গেয় সুরের কথা এখানে শেষ করি। এখন আসল সুর।

গানের শুদ্ধ বাণীরূপের নিজস্ব যে সুর, সেই সুরময়তার অপর নাম ছন্দ। ছন্দ বিশ্ববাণীর রসের স্পর্শামৃতে বাচ্যকে অভিসিঞ্চিত করে। এর হিল্লোলে প্রাণ হিল্লোলিত হয়। বাউলপদাবলীর কাব্যস্তরে উত্তরণের মূলে প্রধানতম উপাদান হিসাবে রয়েছে প্রকাশের এই ছন্দিত রূপ। গেয়-সুর-বিরহিত বাউল পদাবলীর আস্বাদন-সময়ে বাণীস্থিত ছন্দই পাঠককে নন্দিত করে। নটরাজের এই নৃত্যছন্দই সুর নামে অভিহিত[১]।

আন্তর সুর

সুর-বিরহে কাব্য প্রাণহীন। সুরকে বাদ দিয়ে বাণীর বিচার প্রাণকে বাদ দিয়ে দেহ নিয়ে টানাটানির মতো। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

সুরের স্বরূপ

'সুরহীন গান শিখাহীন প্রদীপের মতো—সঙ্গীত বাদ দিয়া সঙ্গীতের বাহনগুলিকে রাখিলে কেমন হয়, যেমন গণপতিকে বাদ দিয়া তাঁহার মুষিকটাকে ধরিয়া রাখা।'

বলাই বাহুল্য গানের আরোপিত গেয় সুর সম্বন্ধেই একথা বলা হয়নি।

মানুষের মনের অজ্ঞাত হলেও এ সুর তার প্রাণের অতিপরিচিত। তাই ব্যক্তিনির্বিশেষে প্রতিপ্রাণে এর সহজ সঞ্চরণ। সর্বজনহৃদয়ে সঞ্চরণশীল সুরময় কাব্যই যদি রোমান্টিকতার অন্যতম লক্ষণ হয়, তবে একথা বলতে বাধা নেই যে বাউলগান, বাউলকাব্য রোমান্টিক। কর্মভাব বা ভোগের কথাকে, জাগতিক কর্মের ধারা ও ধরণকে

[১] কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার বাঁধা সেতার। কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে......সুর পদার্থটাই একটা বেগ। সে আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্ছে......সে স্বপ্রকাশ। —ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ

উপজীব্য না করলেও, আত্মযুক্ত হয়ে সংসার ভাবের নিরসন এর উপাশ্রয় হলেও বাউল কাব্য রোমান্টিক [১]।

সুরময়তাই বাউলগানের কাব্যত্ব। তাই অতাত্ত্বিক মনেও বাউলের আদর কম নয়। বাউলের গানে তত্ত্বের নির্দেশ থাকলেও সহজসুরে কথিত হওয়ায় তত্ত্বরূপের চেয়ে কাব্যরূপটাই সর্বজনের গ্রহণযোগ্য হয়। বাউলগানের সর্বাঙ্গীণ সমাদর দেখা দেয়। সেইখানে তার সর্বজনীনতা। তাত্ত্বিক উৎকর্ষ ও অপকর্ষের মধ্যে সর্বজনীনতা নেই। তত্ত্বের প্রকাশে এ কাব্যে সর্বজনের সমাদর লাভের চেষ্টাও নেই। সহজভাবে সুরের প্রাধান্যে অজ্ঞানজ বিষয়ের নিরসনের মধ্য দিয়ে জ্ঞান-বিষয়ের প্রকাশ করাই বাউলকাব্যের বৈশিষ্ট্য। আর সুরের দ্বারা সর্বজনগৃহীত হয় বলেই তা কাব্য। উপমালঙ্কার কাব্যের অভিব্যক্তিতে দেখা যায়। বাউল গানেও স্থানে স্থানে উপমা অলঙ্কারাদির প্রয়োগ আছে। কিন্তু তার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কারণ কাব্যের প্রকাশে উপমাদির প্রয়োজন থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু উপমার ছটা দিয়ে কাব্য রচনা করলেই কাব্য হয় না। উপমা অলঙ্কারের বিচিত্র বিনিবেশেই কাব্যের কাব্যত্ব নয়।[২] কাব্যপ্রাণ তার ছন্দিত রূপে। শিক্ষা বা অনুকরণের দ্বারা ছন্দ-রূপ প্রকাশ

বাউলের কাব্যত্ব

[১] ‘মিষ্টিক সাহিত্য’ নামে একটি শব্দ কোনো কোনো মহলে প্রচলিত আছে। অনেকে বাউলকে এই পর্যায়ে ফেলেন। আমরা সাহিত্যে মিষ্টিকতা স্বীকার করি না। বাউলও মিষ্টিক নয়। তার বক্তব্যে কোথাও অস্বচ্ছ কুহেলিকা নেই।

[২] ভরতশাস্ত্রে দেওয়া আছে: ‘রঙে ন বিস্তৃতে চিত্রম্ ন ভূমৌ ন চ বাহনে’ অর্থাৎ চিত্র বর্ণের ভিতর, পটভূমির মধ্যে বা আধারের ভিতর নেই। সে আছে ভাবের মধ্যে। কাব্যেও তাই।

ক'রে কাব্যের প্রকাশও সম্ভব নয়। ছন্দের কবিতেই ছন্দোবদ্ধ কাব্যের প্রকাশ। বিচরিত ছন্দ-রূপে কাব্যের প্রকাশ নয়।[১]

উপমা অলঙ্কার প্রভৃতি রূপের পরিপাট্যেই সুন্দরের সহজ শান্ত স্বরূপের প্রকাশ হয় না। শুদ্ধ রূপ-পরিপাট্যে আবেগতীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, শান্ত সহজ আনন্দের প্রকাশ ঘটে না। তাই রূপ-পরিপাট্যেই কাব্যত্ব নয়। আবেগ-বিহীন সহজানন্দের প্রকাশ রূপ-পরিপাট্যেরই মাধ্যমে সম্ভব নয়। কাব্যে উপমা অলঙ্কারাদি সাজসজ্জা জায়গা পায়, জায়গা জোড়ে না। প্রকাশের ক্ষেত্রে সে আভরণ পৃথক যত্নে, চেষ্টিত ভাবে আসে না, আসে কাব্যের সহজ ধারায়, সহজ ভাবে। তাই উপমা প্রয়োগের নৈপুণ্য বিচার কাব্য বিচারের অঙ্গ নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। সে নৈপুণ্য বিচার তখন চলে, যখন তার মূলে থাকে পৃথক যত্ন, স্বতন্ত্র চেষ্টা, সচেতন প্রয়াস, মহৎ কাব্যের যা লক্ষণ নয়। শুধু সজ্জার পরিপাট্যে আবেগচঞ্চল sensational art এর সৃষ্টি হয়, রূপের জগতে রূপাসক্ত ব্যক্তির অন্তরে তা আবেগচঞ্চল sensation এর সঞ্চার করে, চাঞ্চল্যেই তার পরিণতি। বাউলকাব্য সে পংক্তিভুক্ত নয়। সুন্দর উপমাদির প্রয়োগ ঘটলেও এ কাব্যে তা সচেতন প্রয়াসপ্রসূত নয়, তাই উপমা অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব বিশ্লেষণ ক'রে বাউল কবির কৃতিত্ব ও বাউল কাব্যের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অর্থহীন।

উপমা অলঙ্কার

বাউলকাব্যের কাব্যত্ব প্রসঙ্গের এক কোটির আলোচনা হ'ল। এখন অপর কোটি—পাঠক বা শ্রোতৃহৃদয়ে তার যে প্রতিক্রিয়া তার কথা বলি। কাব্যের যে সুরময়তা, শ্রোতাচিত্তে তার প্রতিক্রিয়াটি বিচিত্র। এ সুর মুগ্ধজনের চিত্ত জাগায়, সুপ্তি ভাঙ্গায়, প্রাণ আনন্দে পূর্ণ করে, বিবশ মনে বুদ্ধি-অতীত বিষয়ের

---

১ এই কারণে চর্যাপদকে কাব্য নামে অভিহিত করা যায় না। দ্রষ্টব্য 'বাংলা সাহিত্যে বাউলের স্থান'।

ঈষৎ আভাস দিয়ে আনন্দ আনে। সুরের আগুন চকিত স্পর্শে

প্রতিক্রিয়া

মুগ্ধ অন্তরে আগুন জ্বালায়। কালো কয়লা, সে ক্ষণিকের জন্য অঙ্গারের প্রোজ্জ্বল রূপ ধরে। আপন-ঘরের 'কাজ-খোয়ানো' গানের সুর সংসারের উপর থেকে পরিচিত আবরণটাকে পলকে ছিন্ন ক'রে অচিনের ইঙ্গিত দেয়; অজানা—সে মুহূর্তের জন্য আভাসিত হয়। বস্তু জগতের হিসেব নিকেশকষা মনে বেহিসেবী ভাবের চমক লাগায়।[১] তাই বাউলগানে যখন শুনি—

'আমি কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যেরে
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে'

কিংবা

'সহজ প্রেম ঘটলো না হায়
সেই মানুষেতে'

তখন সংসার-বিমুগ্ধ মনে শান্ত বৈরাগ্যের উদয় হয়। প্রাত্যহিকের পরিচিত নির্মোক পলকের জন্য সরিয়ে দিয়ে আসল মানুষটি উঁকি মারে।

১ গানের টানা জালে
নিমেষ-ঘেরা বাঁধন হতে টানে অসীম কালে —রবীন্দ্রনাথ

সংসারে ক্ষুদ্র কালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয়, চিরকালটা থাকে আড়ালে; গানে চিরকালটাই আসে সামনে, ক্ষুদ্র কালটা যায় তুচ্ছ হয়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়।

—যোগাযোগ, রবীন্দ্রনাথ

গানের সুরের আলোয় এতক্ষণে সত্যকে দেখলুম। অন্তরে সর্বদা এই গানের দৃষ্টি থাকে না বলেই সত্য তুচ্ছ হয়ে সরে যায়। ··সুরের বাহন সেই পর্দার আড়ালে সত্যলোকে আমাদের নিয়ে যায়। —রবীন্দ্রনাথ

গেয় সুরের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে গানের সূক্ষ্মতর এই সুরকে বাণীস্থিত সুর বলে অভিহিত করেছি। কিন্তু সেও ঠিক সত্য নয়। আপাতসত্য হিসাবেই তা'কে গ্রহণ করেছি।

গুণীর মীড়

আসলে এই সুর গায়কের মধ্যেও নেই, ঠিক বাণীর মধ্যেও নেই, অন্তর্নিহিত পরমপুরুষের আকাশে সেই সুরের প্রকাশ। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'কোন গুণী আজ উদাস প্রাতে
মীড় দিয়েছে কোন বীণাতে' —গীতালি

এ হ'ল সুর সম্বন্ধে শিখরলোকের কথা। বিশ্বকবির কাছে সুরের স্বরূপটি কি সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে। এ প্রসঙ্গে আর অগ্রসর হওয়া নিষ্প্রয়োজন এবং তা সম্ভাব্যের সীমারও বাইরে।

গানের তানে প্রাণের আনন্দ পূর্ণতা লাভ করে। শ্রোতৃহৃদয় উত্তীর্ণ হয় শান্তলোকে। গান সমে এসে পৌঁছায়, আর প্রাণ প্রশান্তিতে পূর্ণ হয়, শান্ত লয়ে আন্দোলিত হয়ে ওঠে।—

'উড়ে যায় বিমানের পানে
শীতল বাতাস লাগে গায়।' —বাউল

বাউলগান শ্রবণে আত্মবিস্মৃত বলে—'আছি', বলে 'বাঁচি'।

সুরের স্পর্শ

এ গান আলোকের শিখা, স্বর্গের দেবদূত।

এই সুরের জন্যই সংসারের অনিত্যতাবিষয়ক সংসারীর অপ্রিয় কথাই প্রিয়রূপে প্রতীয়মান হয়, অন্তরে আনন্দের সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি—

'সংসারে কিছু স্থায়ী হয় না, সকলই অস্থায়ী, এ কথাটা সংসারীর পক্ষে নূতন নহে, প্রিয়ও নহে, ইহা একটা অটল কঠিন সত্য। কিন্তু তবু বাঁশির মুখে শুনিতে এতো ভালো লাগিতেছে কেন। কারণ, বাঁশিতে জগতের এই সর্বাপেক্ষা সুকঠোর সত্যটাকে সর্বাপেক্ষা সুমধুর করিয়া বলিতেছে। মনে হইতেছে মৃত্যুটা রাগিনীর মতো সকরুণ বটে, কিন্তু রাগিনীর মতোই সুন্দর। জগৎ-সংসারের বক্ষের উপর গুরুতম যে জগদ্দল পাথরটা চাপিয়া আছে, এই গানের সুরে সেইটাকে কী এক মন্ত্রবলে লঘু করিয়া দিতেছে।

একজনের হৃদয়কুহর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে যে বেদনা চীৎকার হইয়া বাজিয়া উঠিত, ক্রন্দন হইয়া ফাটিয়া পড়িত, বাঁশি তাহাই সমস্ত জগতের মুখ হইতে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া এমন অগাধ করুণা-পূর্ণ অথচ অনন্ত সান্ত্বনাময় রাগিনীর সৃষ্টি করিতেছে।' —পঞ্চভূত

বলাকার একটি বিস্ময়কর পংক্তিতে এই সত্যটি ভাবঘন, রসনিবিড় আশ্চর্য মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।—

'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'

একান্ত জড়বস্তুর যে বিরাট স্তূপ চিরস্থবিরত্বের অচল মূর্তি নিয়ে আমাদের সামনে অটল হয়ে থাকে, সুরস্পর্শে চেতনার পরিবর্তনে তার কী আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে। মুহূর্তে মনে হয় তার শিকড়-গাড়া স্থবির মূর্তির অচলতা ভান ছাড়া আর কিছু নয়, আসলে ঐ আপাত-জগদ্দলতা একটা মস্ত ফাঁকি, আসলে বিশ্বের ছন্দিত গতিবেগ ওর মধ্যেও আছে, আমরা অস্বচ্ছদৃষ্টি, তাই চোখে পড়ে নি। তাই চেতনার জাগরণ-মুহূর্তেই দেখা যায় ঐ পর্বত বৈশাখী আকাশে মেঘের মতো উধাও হয়ে চলেছে ভারহীন, লঘুগতি। প্রাণ যেখানে নেই সেখানে জড়ত্ব। সুর যেখানে নেই সেখানেই চিন্তার স্তূপ ভাবনার ভার। সুরই প্রাণ। সুরে যখন প্রাণকে জাগায়, তখন গানও জাগে অন্তরে। আর সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের, ভয়ের মুখোশ খসে যায়, তার বিকৃত, বিভীষিকাময় নিপুণ অভিনয়ে যবনিকাপাত ঘটে।

এই রাগিনীই বাউলের সঙ্গে বাউলের শ্রোতাকে, জীবনমুক্তের সঙ্গে সংসারীকে যুক্ত করেছে আত্মার আত্মীয়তার সূত্রে। 'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে'—

যোগ

বাউল যখন উদাত্ত কণ্ঠে একতারা হাতে গান ধরে, তখন জ্ঞানের চকিত-জাগরণজনিত আনন্দে শ্রোতাও তার সঙ্গে মনের কণ্ঠ মেলায়। এখানেই বাউল গানের কাব্যিক সার্থকতা। এমনিভাবে যুগল-মিলন না ঘটলে বাউলকে কবি অথবা বাউলগানকে কাব্য নামে অভিহিত করা সম্ভব হ'ত না।

বাউলগানের দর্শন

বাউলগানগুলি মুখ্যত দর্শন, বাউল দার্শনিক। তবু যে এ গানগুলিকে কাব্য এবং বাউলকে কবি বলা হয়েছে, তার কারণ এর সুরময়তা। এরই জন্য মূলত দর্শন হলেও বাউলগান কাব্যস্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে।[১] অন্যথায় একে শুধু দর্শন নামেই অভিহিত করতে হ'ত। কারণ দর্শন ও কাব্য এক নয়।[২] দার্শনিক ও কবি অভিন্ন নয়। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন—

'A true poet will be a philosopher and a true philosopher a poet.'[৩]

কিন্তু এ উক্তি একান্তভাবেই ভ্রান্তিমূলক। কবি ও দার্শনিক এক নয়, যদিও দর্শন অর্থাৎ সর্বদর্শন উভয়েরই আছে। সর্বের জ্ঞান ছাড়া যেমন প্রকৃত কাব্য হয়না, তেমনি দার্শনিকতাও অসম্ভব। কিন্তু অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে উভয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। অর্থাৎ কার্য স্বতন্ত্র। আর কার্যসঙ্কেতেই যখন জগতে নামসঙ্কেত হয়, তখন কবিকে দার্শনিক কিংবা দার্শনিককে কবি বলা যায় না।

দর্শন ও কাব্য

রাধাকৃষ্ণণের আলোচনার প্রধান ত্রুটি এই যে তিনি দর্শন (সর্বদর্শন) ও দার্শনিকতার পার্থক্যটি উপলব্ধি করতে সমর্থ হন নি। শুধু তাই নয়, দর্শন ও কাব্যের স্বরূপালোচনা করতে গিয়ে আরও গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন—

১ দ্রষ্টব্য—'বাউলগানে কাব্যত্ব'

২ দ্রষ্টব্য—'বাউল ও রবীন্দ্রনাথ'

৩,৪ Philosophy of Rabindranath : Dr. S. Radhakrishnan.

'Philosophy is the temple of truth, while poetry is the shrine of beauty. The two are not opposed as truth is beauty and beauty truth.'[8]

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের মত

তাঁর মতে দর্শন ও কাব্য উভয়ের উদ্দেশ্য এক, যদিও পন্থা স্বতন্ত্র। একই সত্যকে দেখা হয়েছে দুটি পৃথক দৃষ্টিকোণে। দর্শন বলে, বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে, কাব্য বলে, বিশ্ব সুন্দর।[৫]

দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত হলেও দার্শনিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত না হওয়াতেই ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের পক্ষে এমনতর মন্তব্য করা সম্ভব হয়েছে। এ কথায় চমক লাগে বটে, কিন্তু আসলে এর মূলে সত্য নেই। প্রথমত সত্য ও সুন্দরের একান্ত অভিন্নত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েও দর্শনে সত্যের ও কাব্যে সুন্দরের প্রকাশ, একথা বলার তাৎপর্য কোথায়? যেখানে সত্য, সেখানেই সুন্দর, উভয়কে কোনো ক্ষেত্রেই একান্ত পৃথক ও স্বতন্ত্র ক'রে দেখা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত দর্শনের দিক থেকে কবি ও দার্শনিকের কোনো ভেদ না থাকলেও উভয়ের প্রকাশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র ও কাব্য একান্তভাবেই সামঞ্জস্যবিহীন। এদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। ধর্মানুসারে একই দর্শনের বা সর্বদর্শনের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি, উভয়ের লক্ষ্য পৃথক।

সর্বদর্শী তত্ত্বার্থজ্ঞের হৃদয়ে বিশ্বদর্শনে যে ভাব জাগে, আন্তর প্রেরণায় সেই ভাবের প্রকাশেই কাব্য রূপ গ্রহণ করে। ভাবের প্রকাশকই কবি। দার্শনিকও সর্বদর্শী, তত্ত্বার্থজ্ঞ। কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে যোগে কবির মতো তাঁর ভাবকে তিনি যথাযথ কখনও প্রকাশ করেন না। জ্ঞান তাঁর অন্তরে পৃথকভাবে ক্রিয়াশীল। তিনি আপন

---

৫ While both philosophy and poetry aim at the same end, their starting points are different. They approach reality from different angles......philosophy tells us that the world is rational, poetry tells us that it is beautiful.—Philosophy of Rabindranath: Dr. S. Radhakrishnan.

বোধ থেকে সৃষ্টি করেন সিদ্ধান্তের, তত্ত্বের। অতত্ত্বার্থের সমালোচনা করেন। অর্থাৎ তিনি সিদ্ধান্তস্রষ্টা। দার্শনিক সর্ববিষয়ের উপলব্ধি ক'রে অ-সর্ববিষয়ের নিরসনের দ্বারা সর্ববিষয়ের নিশ্চয় করেন। তাই দর্শনে সর্ববিষয়ের নিশ্চয় হয়; কবির কাব্যে শুধু সর্ববিষয়ের প্রকাশ ঘটে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে জগতের সংযোগে যে ভাব হয়, দ্রষ্টা কবি সেই ভাবকে প্রকাশ করেন। দর্শনে কিন্তু এমন ভাবের প্রকাশ নেই। ভাব-জ্ঞানের পর অ ভাব নিরূপণের দ্বারা সিদ্ধান্তসৃষ্টিতেই দর্শনের স্বরূপ। সুতরাং কবির বিষয় ও দার্শনিকের বিষয় বিভিন্ন। বিষয়-বিভিন্নতাতেই নাম-বিভিন্নতার উদ্ভব। একজন কবি আর একজন দার্শনিক।

কবি ও দার্শনিক

কবিতে সত্যস্বরূপের প্রকাশ, দার্শনিকে সত্যস্বরূপের সিদ্ধান্ত। কবি ভাবস্বরূপের প্রকাশ করেন, দার্শনিক ভাবস্বরূপ-নিরূপিত ভাবপ্রক্রিয়ার নির্দেশ দেন। একের বৈশিষ্ট্য স্বরূপের প্রকাশে, অন্যের বৈশিষ্ট্য স্বরূপ-দৃষ্টিতে স্বরূপের সিদ্ধান্তে। উভয়েই স্বরূপজ্ঞ, স্বরূপজ্ঞান উভয়েরই বিদ্যমান, কিন্তু স্বরূপজ্ঞাপনে উভয়ের পন্থা বিভিন্ন। কবির কাব্যে সর্বভাবের প্রকাশ। অন্তরে ভাবটি যেমন জাগে, কবি ঠিক তেমনটি অভিব্যক্ত করেন। কিন্তু দার্শনিক দুই বিরুদ্ধভাব প্রদর্শনের দ্বারা সর্বতত্ত্বের সিদ্ধান্ত করেন, তিনি শুধু এ কাজেই নিযুক্ত, তাঁর পক্ষে স্বরূপের শুদ্ধ প্রকাশ সম্ভব নয়। এখানেই দার্শনিক ও কবির, দর্শনশাস্ত্র ও কাব্যের পার্থক্য।

এই বৈষম্যের মূলে আছে প্রাক্তন।[১] অর্থাৎ সংস্কার বা জন্মার্জিত অভ্যাস। অভিব্যক্তি সেই অভ্যাসানুগ বা অভ্যাসপ্রসূত। কবিত্ব বা দার্শনিকতা ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে, জীবনে সে দৃঢ়মূল। তাই

সংস্কার

---

[১] জ্ঞানের বিকাশ হলেও ব্যবহার সর্বত্র সমান হয় না। ব্যবহার নিয়মিত হয় পূর্বসংস্কার দ্বারা—উপনিষদের আলো: ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার।

একের পক্ষে অন্যের ধর্ম অবলম্বন ও কার্য গ্রহণ আদৌ সম্ভব নয়। ধর্মান্তর বা কার্যান্তর গ্রহণ ব্যক্তির ইচ্ছা সাপেক্ষ নয়। দার্শনিকের কবিতে রূপান্তর যেমন অসম্ভব, তেমনি কবির পক্ষেও দর্শনশাস্ত্র সৃষ্টি সম্ভাব্যের অতীত। পূর্বেই বলা হয়েছে, যে-মন স্বরূপের সিদ্ধান্ত নিরূপণে নিযুক্ত, তার পক্ষে স্বরূপের প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সে মনের প্রবণতা কার্যস্বরূপের সিদ্ধান্তের দিকে, শুধু প্রকাশের দিকেই নয়। বিরুদ্ধভাব প্রদর্শন ক'রে সিদ্ধান্ত করাতেই সে মনের গতি। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটা অর্জিত। তাই দার্শনিকের কবি হওয়া সম্ভব নয়, কবির দার্শনিক হওয়াও অসম্ভব। এই কারণেই রাধাকৃষ্ণণের—

'And if this theory is held with a certain intensity and depth of feeling, if it captures the whole consciousness instead of being merely intellectually assented to, then the philosophic vision becomes creative and poetic.'[১]

এ উক্তিকে যথার্থ বলে গ্রহণ করা চলে না। অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে দর্শন ও কাব্যের পার্থক্য মৌলিক। তাই দর্শনের সিদ্ধান্ত-মূলক রচনায় রং ফলালেই কাব্য হয়ে ওঠে না। 'In poetry philosophy lives, it puts on flesh and blood'.[২] সত্য নয়। দর্শনের কঙ্কালে রক্তমাংসের আরোপণ দর্শনকে কাব্যে রূপান্তরিত করে, এ ধারণা ভ্রান্তিমূলক।

বাউলগানগুলি দার্শনিক অভিব্যক্তি, প্রকৃত কাব্যিক প্রকাশ নয়। প্রকাশের ক্ষেত্রে কাব্য থেকে এ স্বতন্ত্র, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। তথাপি দর্শন হয়েও এ কাব্য হয়ে উঠেছে। একে কাব্য পর্যায়ে ফেলা হয়েছে, তার কারণ এর ভাষার মাধুর্য কিংবা উপমাদির সৌন্দর্য নয়, কারণ এর মধ্যে সুরের প্রকাশ ঘটেছে। সিদ্ধান্তমূলক হলেও কথাগুলি সুরে অভিব্যক্ত, তাই

১, ২ Philosophy of Rabindranath : Dr. S. Radhakrishnan.

তা প্রাণে দোলা দেয়, আনন্দের সঞ্চার করে। পরিণতির এই আনন্দই বাউলগানের কাব্যিকতার প্রাণ। আনন্দদানের ব্যাপারটিকে কাব্যলক্ষণ ধরলে বাউল অবশ্যই কাব্য, যদিও ভাবস্বরূপের প্রকাশ-রূপ লক্ষণের দিক থেকে প্রকৃত কাব্য বলা চলে না। সুরগত, আনন্দগত দিক থেকে বাউলের কাব্যরূপ অবশ্য স্বীকার্য। এ সেই অর্থে কাব্য যে অর্থে উপনিষৎ কাব্য। যখন শুনি—

বাউল ও উপনিষদের কবি

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্।
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

তখন শুধু দর্শনের বাণী শুনিনা, অন্তরে কাব্যিক সুরের দোলা আনন্দের সঞ্চরণ ঘটায়।

বাউল কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নয়, উপনিষদিক কবির সঙ্গে সমধর্মী। বাউল কাব্য উপনিষদিক কাব্যের গোষ্ঠীভুক্ত, উভয়ক্ষেত্রেই কাব্য মুখ্যত শ্রুতিসঙ্গতিমূলক বা সুরমূলক।

কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার। ছন্দে লেখা ভাষায় ভাবপ্রকাশ করাটাই কবিত্ব নয়। তাই ছন্দে লেখা ভাষায় সিদ্ধান্তের প্রকাশ করলেই কবি বলা যায় না। তেমন হলে চর্যাপদকেও কাব্য নামে অভিহিত করতে হ'ত। চর্যা ও বাউলের বিষয়বস্তুগত পার্থক্য নেই, কিন্তু উভয়ের প্রকাশ স্বতন্ত্র। তাই সিদ্ধান্ত-মূলক চর্যা কাব্য নয় অথচ সিদ্ধান্তমূলক হয়েও বাউল কাব্য। চর্যায় যে ছন্দ তা বিচরিত, বাহিরের নিষ্প্রাণ আরোপণমাত্র। রচয়িতাগণ কাব্যকে রাগরাগিনীর এক একটি বিশেষ ছকে ফেলেছেন। সেখানে আছে প্রতি পদে একটা শিক্ষিত সুরের একঘেয়ে ঝঙ্কার।[১] কিন্তু বাউল-গানের সুর বাহিরের আরোপিত পদার্থ মাত্র নয়।

বাউলগানে দর্শন ও কাব্যের সমন্বয়

[১] এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 'বাংলা সাহিত্যে বাউলের স্থান' পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

ছন্দ বিষয়-অসম্পৃক্ত স্বতন্ত্র নির্মোক মাত্র নয়, বাণীর অন্তরেই তার উৎস, তার স্থিতি। সে সুর সহজ সুর। অর্থাৎ বাউলগানগুলি সুরেই গাওয়া, সুরেই রচা। তাই গান শ্রবণে শ্রোতৃহৃদয়ে সহজানন্দের স্বতঃস্ফুরণ হয়। কবির ছন্দে যে সহজ গতি থাকে, বাউলে তাকেই লাভ করি। এখানেই চর্যাপদ ও বাউলগানে পার্থক্য। একটি ছন্দে লেখা হয়েও দার্শনিক তত্ত্বমাত্র, প্রাণে আনন্দ দানের ক্ষমতা তার নেই, অন্যটির ছন্দিত প্রকাশে হৃদয়ও নন্দিত হয়ে ওঠে। তাই মূলত দর্শন হয়েও দার্শনিক সীমা অতিক্রম ক'রে এ গানগুলি কাব্যের রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট।

॥ ২ ॥

বাউলগানে বাউলের জীবনদর্শন অভিব্যক্তি লাভ করেছে। বাউলদর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে ঐকান্তিক উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য এখানে ব্যক্ত হয়েছে। দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় বাউল কখনও এর সীমারেখাটি অতিক্রম করে নি। আপন দৃষ্টি-বহির্ভূত সুদূর লোকের কাল্পনিকতার কুহেলিকা তার বর্ণনাকে আচ্ছন্ন ক'রে উক্তিকে যুক্তিহীন বিবৃতিতে ভারাক্রান্ত করে নি। এখানেই গীতাদির পন্থা ও বাউলপন্থা অভিন্ন। যেটুকু আপনার কাছে একান্ত স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, যার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানের নিঃসংশয় পূর্ণতালাভ ঘটেছে, প্রাণের সেই বিশুদ্ধ উপলব্ধি-সঞ্জাত অভ্রান্ত সত্যকেই বাউল গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।

বাউল দর্শনের উপজীব্য

জীবের আদি ও অন্ত, সূচনা ও পরিণতি অব্যক্ত, অজ্ঞেয়;

শুধু তার মধ্যবর্তী ক্ষণিক অস্তিত্বটুকু প্রত্যক্ষ, ব্যক্ত।[১] অসীম অজানার মহাসমুদ্রে একটুখানি ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো। এই ব্যক্তিকে নিয়েই বাউলের আলোচনা। বাউলের দর্শন ব্যক্তের স্বরূপ-নির্ণয়, তার গতি ও প্রকৃতির বিশ্লেষণ।

দর্শন কী ?

ব্যক্তির জগতে নানা বৈষম্য। ভেদেই ব্যক্তির প্রকাশ। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দৃষ্টিগত অনৈক্য, চিন্তাগত বিভেদ, মননগত বিরোধ। সকলের মত ও পথ স্বতন্ত্র। সিদ্ধান্ত পৃথক। ব্যক্তির জগতে জীবনকে দেখার দৃষ্টি-কোণের বহুবৈচিত্র্য বশত ব্যক্তির জীবনদর্শনও বিচিত্র। এখানে স্বভাবতই ধাঁধা লাগে, বহুবিধ মতের মধ্যে কোনটি ঠিক, কোনটি ঠিক নয়, কোনটি গ্রহণীয়, কোনটি নয়। কিন্তু পরস্পর-বিরোধী বহুবিচিত্র দর্শন প্রকৃতপক্ষে দর্শনই নয়। প্রকৃত দর্শন হ'ল আত্মদর্শন। ব্যক্তি-জীবনের ক্রমিক বিকাশে সেই দর্শনলাভ ঘটে।[২] এই দৃষ্টি জাগার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বজগতের স্বরূপটি উদ্ঘাটিত, প্রত্যক্ষীভূত হয়। বাউলগানে এই দর্শনের প্রকাশ।

১ পরাণ আমার স্রোতের দীয়া
আমায় ভাসাইলা কোন ঘাটে।
আগে আন্ধার পাছে আন্ধার, আন্ধার নিসুইৎ-ঢালা।
আন্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা।
তার তলেতে কেবল চলে নিসুইৎ রাতের ধারা,
সাথের সাথি চলে বাতি নাইগো কূল কিনারা।

—বাউল

তুলনীয়—অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮।২য় অধ্যায়,
গীতা

২ বিকার থাকলে, কত কি বলে, বিকার সেরে যা বলবে তাই শুনতে হয়। —শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য় ভাগ

দার্শনিক বাউল আপন স্বচ্ছ জ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে জগতের স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে তাকেই ব্যাখ্যা করেছে। ব্যক্তির স্বরূপ কেমন, বৈশিষ্ট্য কী, জগতে এর চর্যার ধর্ম ও ধারা কী জাতীয়, এর দুঃখানুভূতির মূলীভূত কারণ কী, এর অবসান কোনখানে এবং কী উপায়ে এমনিতর বিচিত্র প্রশ্নের উত্তর বাউল দর্শনে নিহিত।

পূর্বেই বলা হয়েছে ভেদে ব্যক্তির প্রকাশ। জাগতিক বিরোধ, বৈষম্য ও সংঘাত-দর্শনে প্রশ্ন জাগে এই ভেদভিত্তিক ব্যক্তির জগতে আবির্ভাবের কারণ কী? সংসারে ব্যক্তির জন্ম হয় কেন? দেখা যায়, জীবনের উপারম্ভ থেকে উপান্ত পর্যন্ত ব্যক্তিমাত্রেই কর্মরত। সুতরাং ব্যক্তিজীবন-দৃষ্টে একথাই বলা যায় যে কর্মের জন্যই সংসারে ব্যক্তির আগমন। কর্মসম্পাদনের উদ্দেশ্যেই জগতে তার জন্ম। বাউল বলেছে—

সংসার ও কর্ম

'মানুষ কাজে হত, কর্মে রত
হ'ল ভবেতে।'

জগতে জাতকমাত্রকেই কর্ম করতে হয়। কর্ম ভিন্ন গতি নেই।[১]

এখন প্রশ্ন, কর্ম করার সার্থকতা কোথায়? বাউল বলে, কর্মের জন্যই কর্ম নয়। এর একটি উদ্দেশ্য আছে, যার সিদ্ধিতে কর্মের সার্থকতা। ব্যক্তি-জীবনের চরম লক্ষ্য আত্মদর্শন। কিন্তু মায়া তার বিঘ্ন। কর্মের দ্বারা মায়ার বিজ্ঞান ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—'কর্ম করতে করতে মনের ময়লা কেটে যায়।' ময়লা যখন নিঃশেষে কাটে, কর্মের দ্বারা মায়াবিজ্ঞান যখন সম্পূর্ণতা লাভ করে, তখনই আত্মার প্রকাশ হয়। যতোকিছু চাঞ্চল্যের শেষ পরিণতি স্তব্ধ পূর্ণতায়। বাউল বলেছে—

বিজ্ঞান

'যার হয়েছে করম সারা
মরার আগে সেই মরেছে।'

১ নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫। ৩য় অধ্যায়, গীতা

কর্মের দ্বারা কর্মকেই নিঃশেষিত করা জীবনের লক্ষ্য। কর্ম সমাপ্তিতেই এর সার্থকতা। সুতরাং কর্মের জন্যই সংসার। কর্মসমাপনান্তে মায়া বিজ্ঞানের দ্বারা আত্মলাভের জন্যই ব্যক্তির জগতে আগমন।

আত্মার অধ্যক্ষতায় ব্যক্তিতে কর্মের সৃষ্টি। আত্মাই সকল কর্মের অধিকর্তা। আত্মার কর্তৃত্ব বাউলগানে সহজ উপমার মাধ্যমে সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। লালন সাঁইয়ের কয়েকটি গানের উদ্ধৃতি নেওয়া গেল—

আত্মা অধিকর্তা

'কোন সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে
দেখো সে আপনি বাজায়, আপনি মজে সেই রবে।
আপনে চোরা আপন বাড়ী
আপনি সে লয় আপন বেড়ি
লালন বলে এ নাচাড়ি কেনে থাকি চুপেচাপে॥'

অন্যত্র

'আপনি রাজা আপনি প্রজা ভবের পারে
বাজীকর পুথলো নাচায় কথা কহায়
আপনি তারে জীবদেহে
সাঁই চলায় ফেরায় সেই প্রকারে।'

'সকল জীবের ঘটে আছে মানুষ বস্তু একজনা'—সেই মানুষই বিভিন্ন রূপের বিচিত্র আধারে লীলাময়। সে-ই ব্যক্তির অন্তরে কর্তারূপে অধিষ্ঠিত। তাই লালন বলেছে—

'গোসাঁই আপনি করে ম্যাজেষ্টারী
আপন পায়ে পরলো বেড়ি।'

ব্যক্তির জগৎ। সে জগৎ কর্মের। তথাপি কর্তা ব্যক্তি নয়। কিন্তু জগতে ব্যক্তির কর্মের প্রকৃতি বড় বিচিত্র।

আত্মার অধিকর্তৃত্বে কর্ম হলেও ব্যক্তিতে কর্মের প্রকাশ হলেই ব্যক্তির কর্মফলে অনুরাগ হয়। এবং সেই কর্মটাকেই আত্মজ্ঞান

করে। এটিই অজ্ঞান, এটিই ভ্রান্তি। এর থেকেই জগতের যতো অশান্তি ও দুঃখ।

'অহং কর্তা' ভ্রান্তির কারণ আত্মার জগৎ হলেও ব্যক্তিতে

মায়াবরণ

আত্মা মায়াবৃত। জ্ঞান অজ্ঞানের আবরণে আবরিত। বাউল বলেছে—

'আগুন আছে ছাইয়ের ভিতরে।'

কিংবা

'অগ্নি যেমন ভস্মে ঢাকা, সুধা তেমনি গরল মাখা।'

জ্ঞানের আবরক এই অবিদ্যা বা মায়া ব্যক্তির চিত্তে ভ্রমের সৃষ্টি করে, তার দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ, চিত্তকে মোহগ্রস্ত ক'রে তোলে। তার 'ভোলা মন' স্বরূপকে বিস্মৃত হয়ে অস্বরূপকে নিত্যজ্ঞানে সেবা করে। বাউল-ভাষায়—'ভবের মাঝে এসে লাগলো দিশে'। এমনি ভাবে সত্যাসত্য, স্বরূপ-অস্বরূপ, নিত্য অনিত্যর পার্থক্য বিস্মৃতিকে ভিত্তি ক'রে ব্যক্তির চর্যা গড়ে ওঠে। ব্যক্তির ভ্রান্তি দ্বিবিধ। প্রথমত অহং কর্তা এই ধারণা, দ্বিতীয়ত কর্মেই আমিত্ব আরোপ, কর্মলিপ্ততা। অধ্যাপনার কর্মে রত ব্যক্তি ভাবে 'আমি অধ্যাপক', ব্যবসায়ে নিযুক্তের ধারণা 'আমি ব্যবসায়ী', দান কার্যে নিরত ব্যক্তি আপনাকে দাতা বলে প্রচার করে। এমনি ভাবে ব্যক্তি আপনাকে কর্মের সঙ্গে অভিন্ন ক'রে ফেলে তাতে গৌরব বোধ ও গর্ব অনুভব করে। এই হ'ল মায়ার স্বরূপ।

মায়াবৃত আত্মা।[১] সে অজ্ঞানীর ন্যায় আচরণ করে। ব্যক্তিতে তার প্রকাশ অভিনব। লালন সাঁই একটি গানে এই লীলাকে প্রকাশ করেছে—

[১] নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫। ৭ম অধ্যায়
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫।৫ম অধ্যায়, গীতা

'সাঁইজীর লীলা বুঝবি ক্ষ্যাপা কেমন করে
লীলাতে নাইরে সীমা কোন সময়ে কোন রূপ ধরে।
গোঁসাই গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়
গর্তে গেলে কূপ জল হয়
সে যে অমনি ক'রে ভিন্ন জনায় ভিন্ন বেশে বিচরে।'

যে মায়া কঠিন নির্মোকের মতো জ্ঞানকে বেষ্টন ক'রে থাকে, তাকে বাউল উপমিত করেছে ডিমের সঙ্গে—

'আমি ডিমে এলেম ডিমে গেলেম।'

পূর্বেই বলা হয়েছে সংসার কর্মক্ষেত্র। কিংবা স্পষ্টতরভাবে বললে বলতে হয়, কর্মক্ষয়-ক্ষেত্র। 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'—কর্মের দ্বারাই কর্মক্ষয়। ব্যক্তির জগতে প্রথম আগমন ঘটে সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাতের মধ্যে। অবিজ্ঞাতের বিজ্ঞানই তখন তার জীবনের লক্ষ্য হয়। কর্মের প্রবর্তনার মাধ্যমে অবিজ্ঞাতের বিজ্ঞান শুরু হয়। মায়াবরণ ক্ষীণ হতে থাকে। বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি মায়ার হ্রস্বতাকে সূচিত করে। মায়াবিজ্ঞানের পরিসমাপ্তিতে জ্ঞানের উদয়।

কিন্তু এখানে একটি বড় প্রশ্ন আছে। সে প্রশ্ন জন্মান্তর সম্বন্ধীয়। মায়ার বিজ্ঞান কি এক জীবনেই সম্ভব? এ সম্বন্ধে বাউলের মত কী? সে কি জন্মান্তরে বিশ্বাসী? গানগুলি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে বাউল জন্মান্তরবাদী। সে বলে, বহুজন্মের মালা গাঁথা বিপুল জীবনপ্রবাহের বহুবিচিত্র কর্মধারার মাধ্যমে মায়ার বিজ্ঞান হয়। অবিদ্যার আবরণক্ষয় এক জীবনের কর্ম নয়। একটি জন্ম ও একটি মৃত্যুর মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র, অতিসীমিত জীবন-খণ্ডে ব্যক্তি যে কর্ম করে, তা মায়াবরণের স্থূলতার তুলনায় নিতান্তই নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর। সেই খণ্ডিত জীবনে অধিগত বিজ্ঞান অধিগম্য বিজ্ঞানের অংশ মাত্র। সুতরাং সর্বের জ্ঞান লাভের জন্য, বিজ্ঞানের পূর্ণতার জন্য একাধিক জন্মের প্রয়োজন। মায়ার বিনাশ জন্মজন্মান্তরের কর্ম সম্পাদনের উপর নির্ভরশীল। বাউলের

মায়া-বিজ্ঞান-বিষয়ক একটি গানের সামগ্রিক উদ্ধরণে তার জন্মান্তরবাদিত্ব সহজেই প্রমাণিত হবে—

'আমি বুঝতে নারি ভেবে মরি ঘটিল একি
আমি ডিমে এলেম, ডিমে গেলেম
হতে নারলেম পাখী।
যুগে যুগে কত যুগ গেল,
তুমি ডিমে বসে তা দিতেছ,
ডিম না ফুটিল।
শুনেছি সাধুর কথা
সময় হলে ডিম ফুটায়ে দেন পক্ষীমাতা।
বল আমার কবে সে দিন হবে,
যেদিন ফুটিবে আঁখি
এ মায়া ডিমের
জ্ঞান ভক্তি বিবেক পেয়ে
কাঙ্গাল মানুষ হয়ে মায়া ডিমে
রয় বদ্ধ হয়ে।
একবার খুলে দাও এ জ্ঞান আঁখি
প্রাণ ভরে তোমায় দেখি
প্রাণের মাঝে।'

আবার অন্যত্র কমলের উপমা গ্রহণ ক'রে বাউল বলেছে—

'হৃদয় কমল উঠছে ফুটে কত যুগ ধরে'।

মায়াবিজ্ঞানের পরিসমাপ্তিতে জ্ঞানের উদয়। তখনই দৃষ্টির বিভ্রম দূর হয়, অস্বচ্ছতা কাটে, লাভ হয় দর্শন। ব্যক্তির আত্ম-পরিচয় ঘটে। এ আর কিছু নয়, নিকটেই যা ছিল, তাকেই আবিষ্কার করা। অতি কাছে থেকেও যা অপ্রত্যক্ষ, অগোচর, অপরিচিত, তাকেই প্রত্যক্ষ করা, জানা। সেই অন্তরতম পরমজনের সম্বন্ধে বাউল বলেছে—

'যার তরে প্রাণ কেঁদেছে
সে যে তোর হৃদয়ে আছে।'

সেই মনের মানুষ 'সঙ্গছাড়া নয় তিলেকে', কিন্তু তবু তার ব্যবধান কম নয়।[১] মোহগ্রস্ত ব্যক্তি তার দর্শন পায় না। দৃষ্টির বাধা দূর না হলে তাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। সেই হ'ল আপন স্বরূপ আপন স্বভাব। তাই বাউল বলেছে—

'গুরু স্বভাব দাও আমার মনে'

আপন কণ্ঠদেশে অলঙ্কার আছে, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নেই, শুধু অন্যত্র অন্বেষণ। মৃগের নিজ নাভিদেশে কস্তুরী আছে, কিন্তু সে তা জানে না। দুধের মধ্যে যেমন ননী, কঠিন প্রস্তরের মধ্যে যেমন অগ্নির অদৃশ্য সত্তা আত্মগোপন করে থাকে, তেমনি 'এই মানুষেই সেই মানুষ আছে'।

'ওকি সামান্যে তার মর্ম পাওয়া যায়
ওসে হৃদকমলে উদয় হলে অজান খবর জানা যায়।
দুধে যেমন ননী থাকে
ধরে খায় রাজহংস তাকে
কারও মন যদি চায় সাধু হতে
ঐ সে রাজহংস সে হয়।
পাথরেতে অগ্নি থাকে
বাহির কর‍্যা ন্যাও তাহাকে
বোকা লালন কয়'।

১ সমুখে যাহারে চাও
পিছনেই আছে সে দাঁড়ায়ে —রবীন্দ্রনাথ

কিংবা—

দুজনে রহিলে একা
কাছে কাছে থেকে' —রবীন্দ্রনাথ

আত্মার অতি নৈকট্য সত্ত্বেও নির্দেশের দ্বারা আত্মার স্বরূপ বোঝানো যায় না।

বাউল এই জাতীয় নির্দেশে বিশ্বাসহীন। বলে, প্রকাশ না হলে স্বরূপ বোঝা যায় না। সে অধরা অলক্ষ্যে বাস করে, তাকে পাওয়া সহজ নয়। অহংকারের সাধ্য নেই তাকে স্পর্শ করে।[১]

'যার নাম আলেখ মানুষ
আলেখে রয়
শুদ্ধ প্রেমরসিক বিনে
কে তারে পায়।'

অহংকার প্রেমের পথে অন্তরায়। সে দৃষ্টির অস্বচ্ছতার মূলে। অস্বচ্ছ দৃষ্টি আনে মানস বিভ্রান্তি। ঋষিকুমার উতঙ্ক যখন রাণীর কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন, তখন রাণীর সমীপবর্তী হয়েও তাঁর দর্শন লাভে সমর্থ হননি। কারণ তিনি ছিলেন অশুদ্ধ, তাতেই তিনি দৃষ্টিহারা হয়েছিলেন। কিন্তু যখনই শুদ্ধ হলেন, তখনই দৃষ্টি ফিরে পেলেন। অমনি রাণীর দর্শনলাভ ঘটল।

মায়ার প্রভাবে জগতে ব্যক্তির দৃষ্টিও এমনি অস্বচ্ছ। তার 'চোখ ডুবেছে রসের তিমিরে'।

'আমার ডুবলো নয়ন রসের তিমিরে
কমল যে তার দল গুটালো
আঁধারের তীরে।
গভীর কালোয় যমুনাতে
চলছে লহরী
রসের লহরী
ও তার জলে ভাসে, কানে আসে
রসের বাঁশরী।

---

১ অহংকার তো পায়না নাগাল
যেথায় তুমি ফেরো
—গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ

আমি বাইরে ছুটি বাউল হয়ে
সকল পাসরি।
ঘর ছাড়িয়ে কেঁদে মরি
ভাসাই কুম্ভ রসের নীরে
আমার চোখ ডুবেছে রসের তিমিরে।' —পদ্মলোচন

'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানম্'—অজ্ঞানের রাজ্যে এসে জ্ঞান সঙ্কুচিত হ'ল—

'কমল যে তার দল গুটালো
আঁধারের তীরে'

ব্যক্তি ও তার ভ্রান্তি

এখানে ব্যক্তি তাই শান্ত, নির্লিপ্ত নয়, চিত্তের যোগে অশান্ত, রসাবিষ্ট, ভোগে তার প্রবণতা। ফল রূপাসক্তি, রসলিপ্সা। নিরীক্ষার বিবর্তন ঘটল। দৃষ্টি ফিরল অন্তর থেকে বাহিরের দিকে। মন আর অন্তরমুখী নয়, বহির্মুখী, আত্মকেন্দ্রিক নয়, রূপকেন্দ্রিক। বাউল গানে আছে—

'রতিতে মতি ঝরে,
মূল খণ্ড হয়।'

ঐক্যের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ভেদ-ভিত্তিক 'বহু' জন্মলাভ করে। অন্যত্র পাই—

'স্বভাবের ভাবেতে সদা
স্বরূপেতে রূপ নেহার।'

স্বভাবেব ভাব-প্রাপ্তিতে ব্যক্তি স্বরূপেই রূপ প্রত্যক্ষ করে। তাই মানুষ 'ঘর ছাড়িয়ে কেঁদে' মরে, ভাসায় 'কুম্ভ রসের নীরে'। রূপকেন্দ্রিক দৃষ্টি একদেশদর্শী, অস্বরূপদ্রষ্টা—বাউল আখায় 'কানা'। আত্মার মায়াগ্রস্ততায় অহঙ্কারের উদয় হয়। জ্ঞানাভাব হেতু কানা মানুষ জগতে ঘুরে বেড়ায় ইচ্ছাভিভূত হয়ে। ইচ্ছাই ব্যক্তির যাবতীয় চর্যার মূলে। ইচ্ছা হ'ল সেই উপাদান যা

ব্যক্তিকে বিশ্বের ঐক্য-সুষমা থেকে বিচ্ছিন্ন, পৃথক ক'রে দিয়ে তার জীবনকে সৃষ্টিছাড়া রূপ দিয়েছে। ইচ্ছাতে বিশ্ব-ছন্দের তালভঙ্গ ঘটায়। ব্যক্তির জীবনবীণায় বেসুর বাজায়। ইচ্ছাই পূর্ণতার বিপরীত।[১] এমনিভাবে ইচ্ছাকাতর ব্যক্তি আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে সংসারে ঘুরে বেড়ায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় তার 'হুঁস' থাকে না। পদ্মলোচন তাই বলেছে—

ইচ্ছা

'ও গুণী কওনা শুনি
কোন গুণে মানুষ হয়েছ
তোমার পিতৃধনের বিনাশ করে
রতি মধ্যিখানে হারিয়ে আছো।'

লালনের একটি গানে পাই—

'মন আমার আজ পড়লি ফেরে
দিন দিন পৈতৃক ধন নিলো চোরে।'

ভ্রান্ত-দৃষ্টি ঘরের ধন ফেলে বাইরে ছোটে। কর্মেই আনন্দ জ্ঞান ক'রে তাতেই অবস্থিত হয়। 'অহং কর্তা' বোধে কাজ করে এবং কৃতকর্মের ফলের আকাঙ্ক্ষা করে। ফলাকাঙ্ক্ষা-প্রীতি ব্যক্তিজীবনের যত কিছু দুঃখের মূল। অশান্তি ও অসন্তোষের বীজ এর মধ্যে নিহিত। কেননা পূর্বে বলা হয়েছে, কার্যের কর্তা জীব নয়। সর্বকর্তৃত্বের পদে অধিরূঢ় আত্মা। তার অধিনায়কত্বে মায়া দ্বারা কর্ম হয়। সুতরাং কর্মের কর্তৃত্ব ও ফলপ্রাপ্তিতে ব্যক্তির হাত নেই। তাই মায়া-মুগ্ধ মানুষ যখন কৃতকর্মের ফল কামনায় উদগ্র হয়ে ওঠে, তখন প্রায়শই হতাশ হতে হয়। অভীপ্সিত ফলের পরিবর্তে এমন ফল দেখা দেয়, যা কল্পনার অতীত। দুঃখ ও অশান্তির মূল কর্মফলকে বাউল তুলনা করেছে সুদের সঙ্গে—

ফলাকাঙ্ক্ষা

---

১ সৃষ্টির সমগ্রতার ধারাটা মানুষের মধ্যে আসিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেছে। তার প্রধান কারণ মানুষের নিজের একটা ইচ্ছা আছে, জগতের লীলার সঙ্গে সে সমান চালে চলে না।.........কথায় কথায় তাল কাটিয়া যায়। —রবীন্দ্রনাথ

'ত্যজিয়ে আসল যে ধন কেন রে মন
স্থদের কারণ টানাটানি'

এই টানাটানিতেই মহাজনের জীবন বিড়ম্বিত হয়। আশার পরিবর্তে গভীর নৈরাশ্য, সুখের পরিবর্তে দুঃসহ দুঃখ, তৃপ্তির পরিবর্তে অপরিসীম অতৃপ্তি দেখা দেয়। অন্তরের শান্তিকে লুপ্ত ক'রে দিয়ে তার স্থান অধিকার ক'রে বসে অন্তহীন অশান্তি ও ক্ষোভ। প্রকৃত পক্ষে কর্ম সম্বন্ধে ব্যক্তির এইরূপ ধারণা অনুচিত, কর্মলিপ্ততা অবাঞ্ছিত। কিন্তু জ্ঞানাভাবের জন্যই এমনিটি ঘটে। জন্মকানা মানুষ আনন্দভাণ্ডার ফেলে বাহিরে আনন্দ সন্ধানে নিযুক্ত—

'হারারে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে'

কিন্তু এই ঘুরে বেড়ানো একদিন সমাপ্তির সীমায় এসে পৌঁছায়। নিরীক্ষা আবার পরিবর্তিত হয় বাহির থেকে ভিতরের দিকে, মায়াবিজ্ঞানের পরিসমাপ্তিতে জ্ঞানের প্রকাশে স্বরূপের প্রকাশ ঘটে। আবরণ-ক্ষয়ের শেষে জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ, অনাবৃত আনন্দের অভিব্যক্তি। এ যেন সূর্যগ্রহণের মতো। রাহুগ্রস্ত সূর্যের পুনর্মুক্তি বা মোক্ষ। শুধু পার্থক্য এই যে আলোক এখানে আপনি আঁধারকে বরণ করে, কোনো বৃহত্তর শক্তির নির্দেশের অনুবর্তনে নয়। 'আলো যবে ভালোবেসে মালা দেয় আঁধারের গলে', তখনই সৃষ্টি হয় সংসারের। ব্যক্তি-জগতের উদ্ভব ঘটে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, অজ্ঞানাবৃত যে জ্ঞান সংসারে আসে, তা জন্মান্তরের গতিপথ বেয়ে কর্মের মাধ্যমে অজ্ঞানাবরণ ক্ষয় করতে থাকে। কর্মের দ্বারা এইভাবে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু এখানে একটি গভীর প্রশ্ন জাগে। এ কর্মের স্বরূপ কেমন? শুধু কর্মের দ্বারাই মায়ার ক্ষয় হয়? বাউল এ সম্বন্ধে কী বলে?

বাউলদর্শনে 'জ্ঞানবিশিষ্ট' কর্মের কথা আছে। অর্থাৎ জীবের জগতে আগমন থেকে মুক্তি পর্যন্ত জন্মজন্মান্তরব্যাপী জীবনপ্রবাহের

সমস্ত কর্ম শুদ্ধ কর্ম মাত্র নয়। এগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও একান্ত স্বতন্ত্রও নয়। জাগতিক জীবনের প্রারম্ভ থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত সমগ্র কর্ম সম্পাদনের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ধারা আছে। একটি নিগূঢ় যোগসূত্রে তারা বিধৃত। প্রতিটি জন্মের কর্ম পূর্ব ও পরবর্তী জন্মের কর্মের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধে যুক্ত। এই সমন্বয়ের মূলে আছে স্মৃতি। কথাটিকে একটু স্ফুটতরভাবে বলা যাক। ব্যক্তির জগতে আগমনেই কর্ম সূচিত হয়। কর্মের উদ্দেশ্য মায়াবরণের

বিজ্ঞানভিত্তিক বা স্মৃতিমূলক কর্ম

ক্ষীণতা সাধন, মায়াবিজ্ঞান। এক জীবনের কর্ম দ্বারা যতটুকু মায়ার বিজ্ঞান ঘটে, পরবর্তী জীবনের চর্যা তাকেই অবলম্বন ক'রে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ ব্যক্তির কর্ম বিজ্ঞানভিত্তিক। বিজ্ঞানানুযায়ী কর্ম। মানুষের মায়াক্ষয়কারী শুদ্ধ কর্মমাত্র নয়, তার মধ্যে গুণগত বা স্তরগত ভেদ আছে। আর আছে পারস্পরিক সম্বন্ধ। বলা যায় এক জীবনের কর্ম পরবর্তী জীবনের কর্মের ভিত্তিভূমি বা ভূমিকা। বিগত জীবনের মায়াবিজ্ঞানানুযায়ী সৃষ্টি হয় সংস্কারের অর্থাৎ পূর্বজন্মের যেখানে সমাপ্তি, পরজন্মের সেইখানে সূচনা। এমনিভাবে ব্যক্তিজীবনে স্মৃতিমূলক বা বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মের প্রকাশ হয়।[১] গীতাও এই মতের পরিপোষক। সেখানে স্থূলভাবে বিজ্ঞান ও

১ ঘরের বোঝা টেনে টেনে পারের ঘাটে রাখলি এনে
তাই যে তোরে বারে বারে ফিরতে হলো গেলি ভুলে।

—গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ

অদৃষ্টেরে শুধালেম চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে।
সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম আমি
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।

—চালক, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

কর্মকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। গুণময় মায়ার এই তিনটি স্তর।

কর্মের মাধ্যমে মুক্তি হয়। কিন্তু কেবল কর্মের মাধ্যমেই মুক্তি আসে না, জ্ঞানবিশিষ্ট কর্মে মুক্তি। কর্মের দ্বারা মায়াবিজ্ঞান হয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটে। যেমন জ্ঞান তেমনি কর্ম।[১] এই কথাটিকে বাউল সহজ ভাষায় বলেছে—

'ওরে যে যা বোঝে সে তাই বুঝে
থাক রে ভোলা
যথা যার ব্যথা নেহাৎ সেইখানে হাত
ডলা মলা।'

বিষয়টিকে ব্যক্ত করতে গিয়ে বাউলগানে একটি বিশেষ শব্দের সার্থক ব্যবহার ঘটেছে। শব্দটি হ'ল 'পিতৃধন'। পূর্বোদ্ধৃত কয় পংক্তি এখানে পুনরুদ্ধৃত করছি—

'তোমার পিতৃ ধনের বিনাশ করে
রতিমধ্যিখানে হারিয়ে গেছ।'

কিংবা

'দিন দিন পৈতৃক ধন
নিলো চোরে।'

পিতৃধন বা পৈতৃক ধন পিতা থেকে পুত্রে, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে সমর্পিত হয়। মানুষের জীবনেও তেমনি জন্ম থেকে জন্মান্তরে কর্মার্জিত জ্ঞানটি অর্পিত হতে হতে চলে। মরণক্ষণে দেহীর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই জন্মের কর্ম সমাপ্ত হয়, কিন্তু কর্ম-লব্ধ জ্ঞানটুকু পরজন্মের জন্য সঞ্চিত থাকে, কর্মের ফলটুকু অনাগতের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়। মৃত্যুতে জীবনের সব যায়। স্থূল দেহ যায়, সে দেহের ধর্ম যায় কর্ম যায়। সংসারের

জ্ঞানবিশিষ্ট কর্ম

---

১ যথা জ্ঞানং তথা কর্মঃ —বেদান্ত

আত্মীয় পরিজন, সম্পদ ও সম্মান ফেলে যেতে হয়, কিন্তু 'যে লাভ সকল ক্ষতির শেষে' সেটা বাড়ে বৈ কমে না ; সে লাভ হ'ল জ্ঞান। সে ধনকে বাউল আখ্যা দিয়েছে—'পিতৃধন'—'আসল ধন'।

'আসল ধনে নাহি চিনে
করিতে চাই মহাজনী'

এটাই হ'ল সংসারের স্বরূপ। তাই সংসারীর নানা দুঃখ ও অশান্তি, ক্ষোভ ও নৈরাশ্য। নিত্য ভেবে অনিত্যের সেবা করার ফল বিড়ম্বনা। অজ্ঞানীর জীবন তাই বিড়ম্বিত। কিন্তু জ্ঞানের প্রকাশে জগতের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। কর্ম-সংসারের স্বরূপ প্রকাশ পায়। নবপ্রভাতের তীরে দল গুটানো কমল আবার প্রস্ফুটিত হয়।

এ স্তরে এসে ব্যক্তি হয় সর্বজ্ঞ। আত্মদর্শী। মোহমুক্ত। কিন্তু মায়ামুক্ত নয়। সেকথা বলাই বাহুল্য। মায়া তখনও নিঃশেষিত হয় না। কারণ মায়ার বিনাশের অর্থ ব্যক্তিজীবনের ধ্বংস, দেহীর সর্বশেষ পরিণতি—মুক্তি। জ্ঞানের উদয়কালে মানুষ হয় গুণময় মায়ামুক্ত, সে তখন বিজ্ঞানোত্তর পর্বে উন্নীত। এ স্তরের স্বরূপটি ভালোভাবে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। পূর্বেই বলেছি জগতে এসে জ্ঞানের আলো মায়ার ছায়ায় আবৃত হয়। কর্মের মাধ্যমে মায়াবিজ্ঞানের পরিসমাপ্তিতে সর্বজ্ঞানের উদয়। এ অবস্থায় বীতমোহ ব্যক্তি আত্মার দর্শন লাভ করে। মায়ার সেই অংশ অতিক্রান্ত হয় যে অংশে মোহের বর্তমানতা। এ হ'ল গুণময় মায়া। অপর অংশ দৈবী মায়া তখনও অনতিক্রান্ত।[১] যার অতিক্রান্তিতে মুক্তি।

[১] দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪।৭ম অধ্যায়, গীতা

গুণময় মায়া সত্ত্ব, রজ, তম ত্রিগুণাত্মিকা।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩।৯ম অধ্যায়, গীতা

গীতায় এই মহাপুরুষের নাম দিয়েছেন 'মহাত্মা'। এঁরাই সর্বদর্শী ও সর্বকর্মকৃৎ।

গুণময়-মায়াবিজ্ঞানোত্তর পর্বে ব্যক্তি দৈবী মায়ার স্তরে বন্ধনমুক্তির সীমানায় উপনীত। গুণময়ী ও দৈবী মায়ার এই দুই রূপ অপরা ও পরা, অবিদ্যা ও বিদ্যামায়া নামে অভিহিত।

বিজ্ঞানোত্তর পর্বের এই কালই প্রলয়কাল। এখানে ত্রিগুণাত্মিকা মায়াস্তরের যতোকিছু সঞ্চয় লয় প্রাপ্ত হয়। দেহী বৈপ্লবিক বিবর্তনের মাধ্যমে নবজীবন লাভ করে। সে হয় জীবনমুক্ত। ঈশানকোণের মেঘ ঝঞ্ঝা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় সূচিত করে। তাই প্রলয়ের প্রসঙ্গে বাউলে বার বার ঈশান কোণের উল্লেখ দেখা যায়। ঈশান প্রলয়ের প্রতীক। ঈশান কোণেই উত্তরায়ণ পথের আরম্ভ।[২] তাই ঈশানকেই প্রলয়েব প্রারম্ভিক স্থান রূপে নির্দেশ করা হয়। এই প্রলয় পথেই জীবনের উত্তরায়ণপথে গতি। মহাত্মাগণ এই উত্তরায়ণ-পথগামী।

প্রলয়

'এ ঘরখানায় আমার কে বিরাজ করে
আমি জনম ভরে একদিনও দেখলাম না তারে।
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে
দেখতে পাইনে এ নয়নে
হাতের কাছে যার ভবের হাটবাজার
আমি ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে।'

—লালন সাঁই

কিংবা

'ক্ষণে ক্ষণে দেখি তারে
ঈশানকোণে ঝিলিক মারে।'

এই ঈশান ও প্রলয়ের বা ঝড়ের কথা রবীন্দ্রকাব্যেও পাই—

'ভৈরব রাগে উঠিয়াছে তান
ঈশানের বুঝি বাজিল বিষাণ
নবীনের হাতে লহ তব দান
জ্বালাময় মালাগাছি।'

---

২ ঈশান—উত্তর-পূর্ব কোণ।

কিংবা

'যেতে যেতে একলা পথে
নিবেছে মোর বাতি
ঝড় এসেছে ওরে এবার
ঝড়কে পেলেম সাথী
আকাশ-কোণে সর্বনেশে
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে
প্রলয় আমার কেশে বেশে
করছে মাতামাতি'

অথবা 'প্রলয়' কবিতায় যেখানে দুর্যোগের ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে—

'আকাশে ঈশান কোণে মসীপুঞ্জ মেঘ
আসন্ন ঝড়ের বেগ
স্তব্ধ রহে অরণ্যের ডালে ডালে'

গীতাঞ্জলির—

'আজি ঝড়ের রাতে
তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার'

অথবা খেয়াকাব্যে—

'ঝড়ের রাতে হঠাৎ এল
দুঃখ রাতের রাজা।'

এই প্রলয়ের কথাই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আপন জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় অপরূপ ভঙ্গিতে বলেছেন—

'যখন আমার এই অবস্থা হ'ল, তখন আশ্বিনের ঝড়ের মত একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে লয়ে গেল। আগেকার চিহ্ন কিছুই রইল না।'

'কুঁড়েঘরে হাতী প্রবেশ করলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙ্গে চুরে দেয়। ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে, আর তোলপাড় করে। হয় কি জান? আগুন লাগলে কতকগুলো জিনিস পুড়িয়ে টুড়িয়ে ফেলে; আর একটা

হৈ হৈ কাণ্ড আরম্ভ ক'রে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কাম, ক্রোধ এইসব রিপু নাশ করে, তারপর, অহং বুদ্ধি নাশ করে। তারপর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে।'
—২য় ভাগ, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

'মহাভাবের অবস্থা। সে অবস্থার পরে আনন্দও যেমন, আগে যন্ত্রণাও তেমনি। মহাভাব ঈশ্বরের ভাব ; এই দেহমনকে তোলপাড় করে দেয়। যেন একটা বড় হাতী কুঁড়ে ঘরে ঢুকেছে। ঘর তোলপাড়, হয়তো ভেঙ্গে চুরে যায়।'
—৩য় ভাগ, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

প্রলয়ে ধ্বংস হয় অপরা প্রকৃতির সঞ্চয়। ব্যক্তিজীবনের বিজ্ঞান-ভিত্তিক কর্মের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। এক জন্মের কর্মে যে বীজ উপ্ত হয়, জন্মান্তরে তাই অঙ্কুরিত, পুষ্পিত ও ফলিত হয়ে ওঠে। জন্মের পর জন্ম হয়। পূর্বজন্মে মায়ার যেমন বিজ্ঞান ঘটে পরজন্মে ব্যক্তির তেমনি বুদ্ধিসংযোগ হয়। এমনিভাবে জন্মচক্রের, কর্মচক্রের আবর্তনে জীব আবর্তিত হয়। এ স্তরে ব্যক্তিজীবন একান্তভাবেই প্রাক্তন-নির্দিষ্ট, অতীত-নিয়ন্ত্রিত। প্রলয়ে প্রাক্তনের সেই নির্দেশ, অতীতের সেই নিয়ন্ত্রণ-শক্তি বিধ্বংস হয়। অতীত-কবলিত জীবন গ্রাসমুক্তি লাভ ক'রে বিশুদ্ধ বর্তমানের তীরে সমুত্তীর্ণ হয়। বাউলগানে এই বার্তমানিক উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে—

'আমি মজেছি মনে
না জানি মন মজলো কিসে
আনন্দে কি মরণে।

বর্তমান :
নিত্যকাল

ওরে আমায় এখন ডাকা মিছে
নাই যে হিসাব আগে পিছে
আনন্দে মন নেচে ওঠে
তার নূপুর বাজে রাত্রিদিনে।'

এ অবস্থায় আর আগে·পিছের হিসাব থাকে না। অতীত-ভবিষ্যৎ-হীন শুদ্ধ, মুক্ত বর্তমানই একমাত্র কাল। এখানে আত্মার বর্তমান রূপ ব্যক্তির নিকটে প্রত্যক্ষীভূত। বাউল বলেছে—

'বর্তমান রূপ যে দেখেছে
তার মনে কি আঁধার আছে।'

উত্তরবিজ্ঞানযুগের বিশুদ্ধ বর্তমানের কথা রবীন্দ্রনাথও নানা ভাবে ব্যক্ত করেছেন—

'অতীত জীবন ছায়ার মতো
চলছে পিছে পিছে
কতো মায়ার বাঁশীর সুরে
ডাকছে আমায় মিছে।
মিল ছুটেছে তাহার সাথে
ধরা দিলেম তোমার হাতে
যা আছে মোর এ জীবনে
তোমার দ্বারে এনেছি।'

—গীতাঞ্জলি

কিংবা

'একা তুমি নিঃসঙ্গ প্রভাতে
অতীতের দ্বার রুদ্ধ তোমার পশ্চাতে।'

কিছু পূর্বেই দেখেছি শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—'আগেকার চিহ্ন কিছুই রইল না।'

এখন এই বর্তমানের স্বরূপটি ভালোভাবে আলোচনা করা যাক। বাউল বা রবীন্দ্রনাথে যাকে বর্তমান বলা হয়েছে, তা হ'ল পরিমিত ব্যক্তিতে উপলব্ধ সর্বকাল বা নিত্যকাল।[১] ব্যক্তি সসীম। তাই ত্রিকালাবাধিত সর্বকাল বা নিত্যকালের স্বরূপ তার সম্পূর্ণ গোচর হওয়া সম্ভাব্যের অতীত। সীমার মধ্যে থেকে তার যে আভাস, তাই 'বর্তমান' রূপে নামাঙ্কিত।

১ আমি তারি দূত
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে

— আকাশপ্রদীপ, রবীন্দ্রনাথ

এ অবস্থায় ব্যক্তির পশ্চাতে ‘অতীতের দ্বার রুদ্ধ’। অর্থাৎ এ জন্মে আর অতীতের অনুপ্রবেশ নেই। পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল প্রলয়ে বিধ্বংস হওয়ায় এ জীবন-সূচনা আর বাসনা-ভিত্তিক নয়। পূর্বজন্মার্জিত ফল আর এ জীবনের বিকাশে সক্রিয় ও সহায়ক নয়। শুভ হোক, অশুভ হোক, কর্মফলমাত্রেই শৃঙ্খল। লৌহ কিংবা স্বর্ণে নির্মিত হলেও শৃঙ্খল শৃঙ্খলই। বিজ্ঞানে শৃঙ্খল ছিন্ন হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে জীবনমুক্তের জীবন কর্মহীন। বস্তুত দেহীমাত্রেরই কর্ম আছে। দেহ বা মায়ার বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত কর্ম নিঃশেষিত হয় না। প্রলয়ে শুধু ব্যক্তির জন্মান্তরীয় পাপপুণ্যের ধ্বংস হয়।

উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে জীবনমুক্ত, বাউল তাকেই বিশিষ্ট বাউলিয়া পরিভাষায় বলেছে ‘জ্যান্তেমরা’ অর্থাৎ জীবনমৃত। জ্যান্তেমরা অহঙ্কার-মুক্ত, কর্মেকর্তৃত্বজ্ঞানহীন, উদাসীন, নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ, শান্ত।

রাধাশ্যাম বাউল বলেছে—

‘মন যদি বাসনা ছেড়ে
মানুষ চাঁদের আশায় ফেরে
তবে মানুষ ধরতে পারে
হতে হয় রে জ্যান্তেমরা।’

অন্যত্র পাই—

‘অনুরাগী জ্যান্তে মরা
মরার আগে সেই মরেছে’

মরার আগে মৃত্যু অর্থাৎ দেহ থেকেও না থাকা। এ অবস্থায় যোগীর দেহ আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় দেহ যদিও দেখা যায়, তবু প্রকৃতপক্ষে তা

‘থাকা ও না-থাকার সীমায় থাকে।’

বস্তুত আতিবাহিক ও আধিভৌতিকে তো ভেদ নেই। তার ভেদ অধ্যাসবশতই হয়। যখন অধ্যাসের উপশম হয়, তখন সেই প্রকৃত আতিবাহিকতারই উদয় হয়। যেমন প্রবুদ্ধ হলে স্বপ্ননগরের কাঠিন্য

থাকেনা, তেমনি অতিবাহিক জ্ঞান সমুদিত হলে এ দেহের আর কাঠিন্য গুরুত্বাদি জ্ঞান থাকেনা, সমস্তই লয় প্রাপ্ত হয়। যোগবাশিষ্ঠে আছে, যারা অনেকদিনব্যাপী সংকল্পময় দেহে অবস্থিত হয়, তাদের দেহ দগ্ধ বা শবীভূত হয়ে গেলেও তাদের লঘুদেহের অনুভব অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে যোগীদের প্রবোধের আতিশয্যহেতু জীবিতাবস্থায়ও ঐরকম সূক্ষ্মদেহ অনুভব হয়ে থাকে। তাই লালন সাঁই বলেছে—

'মলে ঈশ্বর প্রাপ্ত হবো কেনে বলে
সেই যে কথার পাই না বিচার
কারো কাছে শুধালে
জীবের এই শরীরে ঈশ্বর অংশ বলি কারে
লালন বলে চেনো তারে
মরার ফল তাজায় ফলে।'

জ্যান্তেমরাই সহজ। সহজ মানুষের স্বরূপ বর্ণনায় বাউল বলেছে—

'সহজ সেই রাগের মানুষ নির্বিকার
জ্যান্তেমরা অনুরাগে মন মজেছে যার।
জ্যান্তেমরা হয় অনুরাগী
ওসে জেতের বিচার আচমন আচার
বেদবিধিত্যাগী ক্ষ্যাপা সে
সে যে লাভে হেসে হয় না আটখানা
আর অলাভে বিষাদের বশে বসে ভাবে না।
ওসে অনাদরে কি সমাদরে সমভাবে নয় বেজার।'[১]

১ দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫।
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭।
—দ্বিতীয় অধ্যায়, গীতা

ব্যক্তি এখানে পালের নৌকা। উজিয়ে চলা ব্যক্তি-সংসারের ঢেউ সে সহজেই অবহেলা ক'রে এগিয়ে চলে। এমনি 'ভাসাইয়া আপনারে সহজের স্রোতে' যে চলা, রবীন্দ্রনাথ তাকে অপরূপ অভিব্যক্তি দান করেছেন। এখানে তা উদ্ধৃত না ক'রে পারছি না।

'ফেনোচ্ছল সে নদীর বন্ধহারা জলে
পণ্যতরী নাহি চলে,
সহজ কেবল অলস মেঘ ব্যর্থ ছায়া ভাসানের খেলা
খেলাইছে এ বেলা ও বেলা।'

—দূরের গান, সানাই

এ অবস্থায় ব্যক্তির কোনো কামনা নেই। কোনো বস্তুকে আয়ত্তে আনার প্রয়াসে বাসনা-মুষ্টি প্রসারিত নয়। দায়হীন, আলগা লীলায় তার আনন্দিত কালাতিপাত। শেষ শরতের মেঘের মতো তার অলস গতিবিধি। ক্ষণে ক্ষণে মেঘ ঘনিয়ে আসে, ক্ষণে ক্ষণে কেটে যায়। সে উদাসীন, আলম্বনবিহীন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'দিগন্তের নীলিমার স্পর্শ দিয়ে ঘেরা
গোধূলি লগ্নের যাত্রী মোর স্বপনেরা।'

—সানাই

ব্যক্তি তখন কর্ম করে, কিন্তু কর্মের সঙ্গে 'আমির' যোগ ছিন্ন হয়। বাউল তার গ্রাম্য ভাষায় এর কথা বলেছে। সহজ কেমন ? না—

'যেমন কাপাস তুলা
ওড়ে আকাশে
যেমন জলের মধ্যে
শেওলা ভাসে।'

এখানে আর ব্যক্তির কর্মে কোনো ইচ্ছা নেই। সেটা কেবল 'অলস মেঘ', ক্ষণে ক্ষণে আকাশকে আবৃত ক'রে আমিকে উত্যক্ত করে, কিন্তু তা ক্ষণিক। ফলের আশায় কর্মলিপ্ততা না থাকায় কর্মবিস্তৃতিতে আবদ্ধ হতে হয় না। ব্যক্তি এ অবস্থায় 'অলেপ',

'বিদেহ'।[১] বন্ধনমুক্ত, সহজ, সরল, স্বচ্ছ গতিতে 'আমির' অগ্রগতি হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'ফলের জন্য নয় তো খোঁজা
কে বইবে সেই বিষম বোঝা
ফল ফললে ধুলায় ফেলে
আবার ফুল ফুটাই' —গীতাঞ্জলি

কর্ম করতে হয়, কিন্তু আমির স্বরূপ-দর্শন থাকায় কর্মফলে স্পৃহাহীন হয়। কর্মে ছুটে গেলেও কর্মফলে লিপ্ত হতে হয় না। তখন বিদিতবেদ্য, বায়ুস্বভাবের 'আমির' স্বরূপটা হয় এই রকম—

'(শুধু) আসে যায়, হাসে আর চায়
নেচে ছুটে যায়, কথা না শুধায়
ফুটে আর টুটে পলকে'

এই পলকে ফুটা-টুটার জন্যই সারাজীবনে সর্বকর্মেই ছোটাছুটি থাকে, কর্মময় জীবনও হয়। কিন্তু—

'সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে'

সব কাজ করলেও কোনো কাজই সে করে না। শুদ্ধ আনন্দ প্রকাশের জন্যই কর্মে প্রবৃত্তি। বিশ্ববিধানে সম্পূর্ণ গা ভাসিয়ে দেওয়াই তার কাজ। বিশ্বছন্দের সঙ্গে তার জীবন ছন্দ এখানে মিশে গেছে। অহংকার এসে তার তাল কাটেনি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'তখন অনুকূলে হাওয়া বয়'। সহজ পুরুষ নিরহঙ্কার, তাই সে প্রেমী। বাউল ভাষায় 'অনুরাগী'। অনুরাগের জন্য প্রয়োজন অহংকারের নাশ।

[১] যেমন সূর্যাতপে হিমকণা এবং শরৎকালের আকাশে শুভ্র মেঘ দৃষ্ট হইলেও অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি যোগী দেহও দৃশ্য হইলেও বস্তুত অদৃশ্য। আধিভৌতিক বাধ হইলে যোগীদের দেহ তূলবৎ লঘুতাপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞানোদয় হইলে এই স্থূল দেহ প্লবনশীল অর্থাৎ আকাশগমনযোগ্য হইয়া থাকে। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকট উহা শরন্মেঘবৎ ক্ষণদৃশ্য হইয়া থাকে।'

—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

'অনুরাগী জ্যান্তে মরা
মরার আগে সেই মরেছে।'

'আত্মহত্যা না হ'লে প্রেম হয় না' (রবীন্দ্রনাথ)। বাউল বলে 'আমরা হলাম নিচু জমি'। উঁচু জমি নয়, অহংকারের উঁচু ঢিপিতে জল জমে না।[১] অহংকারী পরম পুরুষের কৃপা পায় না। অহংকারী যে, সে প্রেম-রসের রসিক নয়। বাউল বলেছে—

'সে প্রেম করতে গেলে
মরতে হয়।'

কারণ—

'আমাদের রসিক নেয়ে
রসিক বিনে নেয়না কারে।
যে জনা প্রেম জানে না চড়তে মানা
ডুবে তরী অল্প ভারে।'

বাউল নিজেকে বলে—'অনুরাগী'। এখানে অনুরাগের অর্থ বিষয়ানুরাগ নয়। আত্মানুরাগ। সকল কর্মে তার থাকে আত্ম-অন্বেষণ। স্বপ্রকাশ আমিকে লাভ ক'রে সর্বদাই—'তারার আলোকে কোন অধরার করে অন্বেষণ'। সেই অন্বেষণেই আকুলতা। এই অনুরাগ বা সহজপ্রেম কামজ নয়। 'আমি ইহা করিব' এইরকম মন্তব্য ক'রে ব্যক্তির যে কর্ম-প্রবৃত্তি, তাই কাম। সাঙ্কল্পিক কর্মই কাম। সহজ প্রেম সঙ্কল্পজ নয়। তাই রূপে আকৃষ্ট হয়ে যে প্রেমের বিকাশ হয়, সে প্রেম সহজিয়া প্রেম নয়। এ প্রেম আত্মপ্রতিষ্ঠিত, এ প্রেমে ব্যক্তির কর্তৃত্ব নেই। সে সম্বন্ধও ব্যক্তির বন্ধুভাবজ বা প্রীতিভাবজ নয়। কোন এক অজ্ঞাত শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠাতে সেই প্রেমের স্বরূপ বিকাশ। দেহের সুষ্ঠু গঠনদৃষ্টে আবেগচঞ্চল মনে অশান্তি প্রকাশ

সহজ প্রেম

---

১ আমিরূপ ঢিপিতে ঈশ্বরের কৃপারূপ জল জমে না —শ্রীরামকৃষ্ণ

করা সহজিয়া প্রেমের স্বরূপ নয়। তাই সে প্রেম মৃতের প্রেম। সেখানে ব্যক্তিক প্রীতিভাববিহীন আত্মিক সম্বন্ধে ভাবের প্রকাশ।

সহজের আমি

সহজ ব্যক্তির যে 'আমি' তা মূর্তামূর্তের মিশ্রণ, তা দেশযুক্ত নির্দেশ, কালযুক্ত অকালিক, তা শূন্য ও অশূন্যের সুন্দর সমন্বয়। শূন্য স্বরূপেই তার অবস্থিতি। কর্মের উদয় হলে অশূন্য সত্য স্বরূপের বা সৎ স্বরূপের উদয় হয়। তাই উপনিষৎ বলেন—

অসৎ বা ইদমগ্র আসীৎ তদ্বৈ স অজায়ত

মায়া এখানে স্বচ্ছতম। বিদ্যামায়া বা দৈবী মায়া গন্তব্যে পৌঁছানোর পূর্ববর্তী স্তর। ছাদে ওঠার শেষ কয় পৈঠা। আর একটু অগ্রসর হলেই পরিনির্বাণ বা মুক্তি।

সহজ অবস্থায় 'আমি' যেমন, কর্মও তেমনি। প্রাক্‌বিজ্ঞানপর্বের কর্মের সঙ্গে এর মিল নেই। 'আমি' এখানে সর্বজনীন, কর্মও সর্বজনীন। এখানে কর্ম আছে, কিন্তু কর্ম-বন্ধন নেই। একদিকে যেমন 'অহং কর্তা' বোধ নেই অন্যদিকে তেমনি নেই ফলস্পৃহা। কর্ম তাই উগ্রতাহীন, নির্বিষ সর্পের মতো। সহজ মানুষের—

সহজের কর্ম

'নাহি কর্ম উপাসনা
ওসে নিষ্কামী হয়ে রয়েছে।
ত্যাজ্য করে ধর্মাধর্ম
বেদবিধি কৃত কর্ম
পাপপুণ্য—জ্ঞানশূন্য
ওসে নির্বেদ হয়ে বসে আছে।'

—মুকুন্দ বাউল[১]

সহজপুরুষ দেহীর স্বাভাবিক এবং অনিবার্য প্রকৃতিবশেই কর্মসংস্পর্শে আসে, কিন্তু আপনাকে সম্পৃক্ত করে না। সে জানে দেহধর্মের কর্মে প্রয়োজন আছে, কিন্তু কর্মে তার প্রয়োজন নেই। তার কর্ম

---

[১] মুকুন্দ গোঁসাই—বর্ধমানের।

সম্পাদন আপন প্রয়োজনবোধে নয়, আত্মার নির্দেশে। এ কর্ম অহঙ্কার-ভিত্তিক কর্ম নয়, স্বাধীন কর্ম, অর্থাৎ স্ব-এর অধীন হয়ে এর সম্পাদনা। এ স্তরে কর্মের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটেছে, যদিও সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। সেটুকু হবার যো নেই।

মায়ার স্বরূপ বিজ্ঞাত হলেও, তার আহ্বান, তার ছলনা ব্যর্থ হলেও তার প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য। তার স্বচ্ছতম আবরণটুকু সামান্য হলেও দুর্ভেদ্য, তুচ্ছ হলেও অলজ্ঘ্য। মায়ার রেশটুকু ক্ষীণ হলেও বর্তমান। মুক্তি বন্ধনের সীমানায় বিলীয়মান মায়া তার সর্বশেষ প্রাপ্যটুকু এইভাবে আদায় ক'রে নেয়। জ্যান্তেমরার জীবনে এই তার নাট্যশেষের ভূমিকা।[১]

এই ভূমিকার পরিসমাপ্তিতে বন্ধনমুক্তির সীমানা উত্তরণে জীবের পরমকাঙ্ক্ষিত চরম অবস্থা—মায়ামুক্তি বা মহানির্বাণ।

মায়াবিজ্ঞানোত্তর সহজ অবস্থায় উত্তীর্ণ বলেই বাউলকে 'সহজিয়া' আখ্যা প্রদান করা হয়। এখন প্রশ্ন এই যে কোনও সাধনের দ্বারা ব্যক্তির পক্ষে এই অবস্থা প্রাপ্তি সম্ভব কিনা, কিংবা সর্বমায়াতীত মুক্তি বা নির্বাণ সাধন-সাপেক্ষ কিনা। এ সম্বন্ধে বাউলের মত কি?

সাধনা

১ যদি বা কাটিল ঘুমঘোর
অসাড় পাখায় তবু লাগে নাই জোর।
যদি বা দূরের ডাকে
মন সাড়া দিয়ে থাকে
তথাপি বারণে বাঁধে নিকটের ডোর
মুক্তি বন্ধনের সীমানায়
এমনি সংশয়ে মোর দিন চলে যায়।
পিছে রুদ্ধ হলো দ্বার
মায়া রচে ছায়া তার
কবে সে মিলাবে আছি সেই প্রতীক্ষায়। —রবীন্দ্রনাথ

বাউল কর্মানুষ্ঠানমূলক কোনো সাধনায় বিশ্বাসী নয়। সহজাবস্থা প্রাপ্তি কিংবা মুক্তিলাভ সে সাধনার অতীত, এটিই বাউলের বিশ্বাস, এই বিশ্বাসের কারণটি বিশ্লেষণ করা যাক।

সৃষ্টির স্বরূপ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। দেখা গেছে ব্যক্তির জগতে আবির্ভাব থেকে আরম্ভ ক'রে বিলয় পর্যন্ত একটি বিশেষ ক্রম আছে। মায়াবরণের ক্ষীণতা-সাধন সেই ক্রমানুযায়ী হয়। ক্ষয়িষ্ণু মায়া ও তৎসহ ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের একটা বিশিষ্ট ধারাবাহিকতা আছে, ব্যক্তি মাত্রকেই সেই ধারার অনুবর্তন করতে হয়। নান্যঃ পন্থাঃ। সহজাবস্থা প্রাপ্তি অথবা মুক্তি আসে সেই ক্রমের পথ বেয়ে। আকস্মিকভাবে দ্রুততার মধ্যে তাকে লাভ করা যায় না। জাগতিক সমস্ত সম্বন্ধেরই সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তাই বলে সমাপ্তির

ক্রম

পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তা অসত্য নয়, পরন্তু ব্যক্তির জীবনে তা একান্ত সত্য। সেই সত্যতাকে অস্বীকার করার স্পর্ধা শুধু মূঢ়তা মাত্র নয়, তার দণ্ডও আছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করলে প্রকৃতি তা ক্ষমা করে না। শাস্তিবিধান করে। মায়ার বিজ্ঞানই স্বাভাবিক, মায়ার অস্বীকৃতি হ'ল মায়ার বিরুদ্ধাচরণ, তাই তা অসহ্য।[১]

বাসনার ক্ষয় সময়সাপেক্ষ, এটিই বিধির অলঙ্ঘ্য বিধান। এই সহজ সত্যটি স্মরণে রাখলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়। জন্ম-জন্মান্তর ধরে দিনে দিনে ব্যক্তির দৃষ্টি-আবরণ স্বচ্ছ হতে থাকে। একান্ত স্বাভাবিক নিয়মে যথাসময়ে সে দৃষ্টিলাভ ঘটে। তার পূর্বে

---

১ সকল সম্বন্ধেরই অবসান হয়, কিন্তু তাই বলিয়া অবসান হইবার পূর্বে তাহাকে অস্বীকার করিলে তো চলে না। অবসানের পরে যাহা অসত্য, অবসানের পূর্বে তো তাহা সত্য। যাহা যে পরিমাণে সত্য, তাহাকে সেই পরিমাণে যদি না মানি, তবে হয় সে আমাদিগকে কানে ধরিয়া মানাইবে, নয় তো কোনদিন কোনদিক দিয়া সুদশুদ্ধ শোধ করিয়া লইবে। —রবীন্দ্রনাথ

মুক্তিলাভেচ্ছায় যতো কর্ম সম্পাদন, সমস্তই অর্থহীন।[১] বাউল এ কথাটাই অতি সুন্দরভাবে বলেছে তার গানে—

'ওরে কাজলে আর করবে কতো
যদি তোর নয়নে নজর না থাকে
ও তোর প্রেম যদি না মিললো ক্ষ্যাপা
তবে ভজন পূজন কদিন রাখে।'[২]

বলেছে—

'মন যদি না মুড়াইলি
কেশ মুড়াইলি অকারণ।'[৩]

'মন না রাঙ্গায়ে রাঙ্গায় যোগী কাপড়া' অন্তরে বাসনাস্তূপ শুধু বাহিরে নানা অভিচারের আয়োজন। এও কিন্তু একদেশদর্শিতার পরিচিতি।

'সাধু কানা অভিচারে'

এমনিভাবে কানার হাটে কানায় কানায় যুক্তি চলে ভবসাগর তারণের। উদ্ধারলাভ অহঙ্কার-ভিত্তিক কর্মদ্বারা সম্ভব নয়।

১ মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতে বলেছেন—
'পর্যায় যোগাদ্বিহিতং বিধাত্রা কালেন সর্বং লভতে মনুষ্যঃ'
—শান্তিপর্ব, মহাভারত

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥
—৩৮।৪ গীতা

কামনা থাকতে যতো সাধনা করো না কেন, সিদ্ধিলাভ হয় না। কামনার পথে কাঁটা পড়লেই ক্রোধ —শ্রীরামকৃষ্ণ

যেমন সমোন্নত পর্বতে আরোহণ ও অবরোহণ দুঃসাধ্য, তদ্রূপ ঐ জ্ঞান সহসা উৎসারিত করা যায় না। —যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

২ শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় সংগৃহীত।

৩ নিজস্ব সংগ্রহ

অথচ মায়ার প্রভাবে ব্যক্তির জগতে এই কর্মেরই প্রাধান্য। এটিই সংসারের স্বরূপ। মুক্তির জন্য দান-ধ্যান-তীর্থ যাত্রা, হঠযোগ, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি বহুবিধ কর্ম এর পরিচিতি। এরই অসারত্ব বাউলগানে অভিব্যক্ত—

কর্ম অসাপেক্ষত্ব

'তীর্থে গিয়ে কী ফল পাবি মন এখন
যদি তীর্থে যাবে আগে তবে করো রে তার আয়োজন।
জাগলে সে জননী কুলকুণ্ডলিনী তীর্থে কিবা প্রয়োজন।
কাঙ্গাল বলে কাতরে
সে যে ঘুমায়ে আছে মূলাধারে।
সে জাগলে পরে আপনঘরে সবতীর্থ হয় দরশন।'

শাস্ত্রপাঠ, নামজপ, ইত্যাদি সম্বন্ধে তার অভিমত—

'না হলে মন সরোলা কী ফল মেলে কথার চূড়ে' —লালন

কিংবা

'আছে যার মনের মানুষ মনে
সে কি জপে মালা
অতি নির্জনে সে বসে বসে
দেখছে খেলা।
কাছে রয়ে ডাকে তারে উচ্চস্বরে
কোন পাগেলা।' —লালন

প্রচারমূলক কর্মে বাউল বিশ্বাসী নয়। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করবার এই যে প্রচারমূলক কর্মে অনাস্থা থাকলেও প্রচারমূলক কর্মীদের প্রতি বাউলের ঘৃণা নেই। কারণ বাউলের সাধনরীতিতে বিশ্বাস নেই, জ্ঞানের প্রকাশ না হলে সাধনের দ্বারা ব্যক্তির পক্ষে স্বরূপের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয় না, তাই যাদের কাছে স্বরূপের প্রকাশ হয়নি, তাদের কর্মের নিন্দা ক'রে নিজেদের কর্মের প্রশস্তি বাউলে নেই। বাউলের ধারণা মায়ার বিজ্ঞান হলে পর আত্মার প্রকাশ হয়, তার পূর্বে কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার দ্বারা আত্মার প্রকাশ করানো সম্ভবপর নয়। বাউলের

জন্ম ও সংস্কার

কাছে জন্মটাই সত্য, যার যেমন ভাব নিয়ে এ সংসারে জন্ম, তার তেমনি ভাবেই কর্ম করা স্বাভাবিক। তাই তারা বলেছে যার যে বিষয় জীবনে সত্য, তার তাই করা প্রয়োজন। লালন বলেছে—

'ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে থাকরে ভোলা
যথা যার ব্যথা নেহাৎ সেইখানে হাত ডলামলা।
তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা
যে জনা দেখে সে রূপ করিয়ে চুপ রয় নিরালা
ওসে লালন বলে ভিড়ের লোক জানানো হরিবোলা
সুখে হরিবোলা।'

জগতে জীব আসে আপন আপন সংস্কার নিয়ে। জীবের ব্যক্তি বা প্রকাশ সেই সংস্কার-ভিত্তিক। আর ভিত্তিভূমির দিক থেকে প্রতি জীবের মধ্যে অতলস্পর্শ ব্যবধান। মানুষে মানুষে এই স্তর বৈচিত্র্য জগতের বৈশিষ্ট্য। যার যেমন সংস্কার চর্যাও তার তেমনি। আপন আপন বোধস্তরে আপন আবেগে ব্যক্তি বিভোর, আত্মহারা, আত্মভোলা। এ ভ্রান্তি স্বাভাবিক, একে ত্রুটি ভেবে সংশোধন করতে যাবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। জীবনের এ স্বাভাবিক ধর্ম। জীবের এই ভাবটিই বাউলকবি লালন সাঁইএর গানে সুন্দরভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

জগতে নানা কর্মভিত্তিক সাধন পদ্ধতি দেখা যায়। বাউল যে একে অস্বীকার করে, তার কারণ এখানেই নিহিত। পূর্বেই বলা হয়েছে মানুষে মানুষে স্তরভেদ আছে, আছে তলগত ব্যবধান। মানবজাতি বহুতলের সামগ্রিক সমষ্টি। এ যদি সত্য হয়, তবে সাধারণ কর্মপদ্ধতির, সাধনপ্রক্রিয়ার সার্থকতা কোথায়?[১] সাধনার

[১] পরমাত্মার সহিত একতাসিদ্ধি জ্ঞানযোগেই লাভ করা যায়, অন্য ক্লেশকর অনুষ্ঠানাদিতে তাহা হয় না। তপস্যা, দান বা ব্রতাদি এ সমুদয় তত্ত্বজ্ঞানের উপকারী নহে, স্বরূপে অবস্থান ব্যতীত ইহার অন্য উপায় নাই

ক্ষেত্রে গোষ্ঠী সৃষ্টির মূল্য কী? সত্যদর্শী বাউল তাই দলবদ্ধ মুক্তি-সাধনায় অবিশ্বাসী। 'ব্যক্তিরূপের ব্যক্ততা সকলের সমান নয়'।[১] তাহলে সমান চর্যা কী ক'রে ব্যক্তিনির্বিশেষে প্রযুক্ত হবে? বাউল এ সম্বন্ধে গীতার সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্নমত। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

স্তরবৈচিত্র্য

> যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
> তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬।
>
> ৮ম অধ্যায়, গীতা

জীবের এই ভাবগত পার্থক্য, ধর্মগত বৈষম্য আছে বলেই প্রত্যেককে আপন আপন স্বধর্মানুসারে কর্ম করতে হয়। অপরের নির্দিষ্ট পথ বা পরধর্ম তার পক্ষে ভয়াবহ। ব্যক্তি জগতে কোনো সাধারণ সাধনপদ্ধতি সম্ভব নয়। তাই গীতার শ্রীকৃষ্ণের এই সাবধান বাণী[২]—

গোষ্ঠী।

> শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
> স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫।
>
> —৩য় অধ্যায়, গীতা

মোহজালের অকৃত্রিম বিনাশসাধন ইহার উপায়। যোগদ্বারা দৃশ্যদর্শনের নিরোধে ফল নাই। তাহাতে জগতের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় না।

—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

যোগসাহায্যে নিগৃহীত চিত্তের যে শান্তি, তাহা প্রকৃত শান্তি নহে। যেমন এক পিশাচের পর অন্য পিশাচ আসিয়া মূঢ়কে আশ্রয় করে, তেমনি সমাধির অবসানেই পুনরায় সংসার উপস্থিত হয়।

-- যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

১ রবীন্দ্রনাথ।

২ উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫।

—৬ষ্ঠ অধ্যায়, গীতা

বাউলের সাধনা তাই দলবদ্ধ সাধনা নয়। একলার সাধনা। তার একতারার তারটির মতোই সে নিঃসঙ্গ, একাকী। মনের মানুষের সন্ধানে একলাই বেরিয়ে পড়তে হয়, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নয়। সহজাবস্থা প্রাপ্তি কিংবা মুক্তিলাভের জন্য তাই প্রয়োজন সমুচিত স্থৈর্য, প্রতীক্ষার ধৈর্য। তাড়াহুড়ায় ফল ফলে না। মুক্তিকামী মুক্তিপ্রিয়ের বেসবুর হওয়া চলে না। তাই যারা স্থৈর্যহারা কর্মোন্মত্ততার পথে মুক্তিসাধনায় ব্যস্ত, তাদের উদ্দেশ্যে বাউল বলেছে—

'রে নিঠুর গরজী
তুই মানস মুকুল ভাজবি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি
সবুর বিহনে
দেখ না আমার পরমগুরু সাঁই
সে যে যুগ যুগান্তে ফুটায় মুকুল
তার তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড, তাই ভরসা দণ্ড
এর আছে কোন উপায়
রে গরজী।' —মদন বাউল

অথবা—

'মন যাতে নয়, পূজলে কি হয়
ফুল দিয়ে শত শত।
যার মনে যা লাগে ভাই
করুক করুক তাই
তাতে গোল কেন আর অত।
লালন বলে লাথিয়ে পাকালে সে ফল
হয়না মিঠে, হয় তিতো।'

'গরজ থাকতে রতন মেলে না', মুক্তির প্রতি অসময়ে অযথা লোভ নিষ্ফল।

'হঠাৎ করে নামতে গেলে
ধরে খায় কাম কুমীরে।'[১]

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'সময় না হলে ত্যাগ ভালো নয়। কারু কারু ভোগ, কর্ম অনেক বাকি থাকে। তার জন্য দেরিতে হয়। ভোগের শান্তি না হলে বৈরাগ্য হয় না।' সুতরাং কালগত উপাদানটিকে বিস্মৃত হলে চলবে না! সময় হওয়া চাই, এই ধ্রুবসত্যটিই বাউল-গানে দুই পাখীর উপমার মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করেছে—

'ডাকে করুণস্বরে, পাখীর হলো কী?
একে ঘোর রাতি, মাঝে নদী, দুপারে দু' পাখী।[২]
সময় একটি পাখী ডেকে বলে
ভেসে যায় সে নয়ন জলে
আমি তোমা বিনে এ ঘোর রাতে কেমনে প্রাণ রাখি।
আর এক পাখী বলে তারে
বিনাইয়া উচ্চস্বরে
হায়রে এখনও যে নিশি বাকি চেয়ে দেখ প্রাণসখা।'

মায়ার নিশি না পোহালে তার দর্শনলাভ সম্ভব নয়। সুতরাং অপেক্ষা ব্যতীত গত্যন্তর কোথায়? দ্বিতীয় পাখী তাই বলেছে—

১ আপাত-বৈরাগ্যবতো মুমুক্ষূন্ ভবাব্ধিপারং
প্রতিজাতুমুদ্যতান্।
আশাগ্রাহো মজ্জয়তেঽন্তরালে নিগৃহ্য কণ্ঠে
বিনিবর্ত্য বেগাৎ॥
—বিবেকচূড়ামণি, শঙ্করাচার্য

২ 'এতবড় গাছে কেবল দুই পাখীর বাসা।'—
স্মরণীয় উপনিষদের দুই পাখীর উপাখ্যান।
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
—মুণ্ডকোপনিষৎ

'তুমি যদি উড় এখন
আমায় পাবে না আর যাবে জীবন।
তাই বলি নিশি পোহাইলে
দুয়ে হবে দেখাদেখি।'

বাউল কবিও তাই নিশিপ্রভাতের অপেক্ষাতেই আছে। তার প্রাণে প্রভাতের প্রার্থনা—

'কাঙ্গাল কেঁদে বলে আবার
কবে নিশি প্রভাত হবে আমার
গিয়ে নদীর পারে মিলবে তবে
আত্মাচকাচকি,
শুনেছি সাধুর কথা
সময় হলে ডিম ফুটায়ে দেন পক্ষীমাতা
বল আমার কবে সেদিন হবে যেদিন ফুটিবে আঁখি
হায়রে মায়াডিমে বদ্ধ হয়ে আর কদিন থাকি।
একবার খুলে দাও হে জ্ঞান আঁখি প্রাণভরে তোমায় দেখি
প্রাণের মাঝে।'

বিশ্বের সৃষ্টির মধ্যে যে বিবর্তন, তার মধ্যে কোথাও ব্যস্ততার, দ্রুততার স্থান নেই, নীরব চক্র ধীর গতিতে আবর্তিত হয়ে চলেছে। গতি আছে কিন্তু তার প্রকট প্রচণ্ডতা নেই। সে গতি একটি অপরূপ সুষমামণ্ডিত স্থিতির আবরণে আবৃত। প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এই সত্যোপলব্ধি সহজ হবে। বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুরের বুক্ষে রূপায়ণ, শাখায় প্রশাখায় পত্রগুচ্ছে তার আত্মবিস্তার কতো স্বাভাবিক। তারপর মুকুলের আবির্ভাব, ধীরে ধীরে তার পরিপূর্ণ প্রস্ফুটন, বিনিঃশেষ বিকাশ। ক্রমে ফুলঝরার পালার মধ্যে ফলের জন্ম। পরিশেষে শিথিলবৃন্ত পক্ক ফলের ভূতলপ্রাপ্তি—এর মধ্যে যে প্রগতি, তা একান্ত প্রচ্ছন্ন। দৃষ্টির অগোচরে এই বিবর্তন। সুনির্দিষ্ট ক্রমের মধ্য দিয়ে এই রূপান্তর। একে বলপূর্বক সংক্ষেপিত করা চলে না। 'সবুর বিহনে' ফুল ফোটানো, বাস ছোটানোর আশা

দুরাশা মাত্র। যতোই বোঁটাতে আঘাত করা যাক, সে ফুল ফুটবে না, অকালে তার কোমল দলের বিনাশ হবে মাত্র। ব্যক্তির বিকাশক্ষেত্রে একই লীলার প্রকাশ। স্থৈর্যবিহীন, ব্যগ্রব্যস্ততা শুধু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই হ'ল বিধির বিধান।[১]

এই বিধানকে অস্বীকৃতি জানিয়ে যে সাধনা, বাউল তাতে বিশ্বাসী নয়। অর্থাৎ বন্ধন এড়িয়ে মুক্তির চেষ্টা নয়, জীবনকে অস্বীকার ক'রে পলায়ন নয়, জীবন জয়ের পন্থাই তার পন্থা। কবিগুরু এক জায়গায় বলেছেন—

'আমি এটা বেশ দেখেছি, বাঁধন সম্পূর্ণ এড়িয়ে মুক্তির চেষ্টায় মানুষ যেখানেই নিরুদ্দেশ হয়ে বেরিয়ে পড়ে, সেখানে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায় এবং যে কাণ্ডটি ঘটে, সে সিদ্ধির আনন্দ নয়, সিদ্ধির নেশা।'

এ জাতীয় সিদ্ধির নেশা নেই বাউল-মনে। সে স্পষ্টই বলেছে—

'কিছু হয়না সাধন ভজনে
অনুরাগ বিনে।
ক্ষেপাচাঁদ বাউলে কয়,
অক্ষরে তার কর্ম নয়
তার মর্ম বুঝতে হয়
ও তোর দেহের মাঝে
পঞ্চ কাঁটা রে
কাঁটা উঠবে রে সময় গুণে।'

---

১ ওদের কথায় ধাঁধা লাগে, তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস, এই তো সবই সোজাসুজি
হৃদয় কুসুম আপনি ফোটে, জীবন আমার ভরে ওঠে
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি, হাতের কাছে সকল পুঁজি।
—নিঃসংশয়, গীতিমাল্য, রবীন্দ্রনাথ

তোরা কেউ পারবি নে গো পারবি নে ফুল ফোটাতে।
—রবীন্দ্রনাথ

অথবা—

(পূর্বে আংশিকভাবে উদ্ধৃত গানটির সামগ্রিক রূপ)

'উপরোধে কাজ দেখ রে ভাই
ঢেঁকি গেলার মত।
ওরে তা যায়না গেলা ওলা গেলা
কেড়ে হয় সে হত (?)
মনটা যাতে রাজি নয়, প্রাণটা তাতে আপনি যায়
পাথর দেখে সোলার মত।
আবার বেগার ঠেলা ঢেকি গেলা
টাঁকশালে সে নাইতো।
মুচির চামকেটোতে গঙ্গামা কোন গুণে যায় দেখনা
কেউ ফুল দিলেও পায় না তো।
মন যাতে নয়, পুছলে কি হয়
ফুল দিয়ে শত শত।
যার মনে যা লাগে ভাই করুক করুক তাই
তার লেগে গোল কেনে এত।
লালন বলে লাথিয়ে পাকায়ে সে ফল
হয় কি মিঠে এত
সে ফল হয় না মিঠে, হয় তিতো।'

এখানেও সেই সময় বা কালগত উপাদানের কথা। সময় হলেই কাঙ্ক্ষিতের দর্শন লাভ ঘটবে, তার পূর্বে নয়। কোনো কর্ম সাধনায় সত্য দর্শন হয় না। দায় যখন হয়, তখন সাধনা না করতে তার দেখা মেলে, সুতরাং কর্মসাধনায় সত্য নেই, সত্যেই সাধনার সঞ্চয়।

তাহলে এখানে প্রশ্ন জাগে, বাউলদের 'সহজ সাধনা'টি কী বস্তু? বাউলদের সহজসাধক যে বলা হয়, তার তাৎপর্য কী? প্রথমেই বলা প্রয়োজন, সহজ সাধনা সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে নানা ভ্রান্ত ধারণা আছে। আসলে সহজ

সহজ-সাধন

সাধনা কোনো বিশেষ কর্মানুষ্ঠান-প্রসূত নয়। সঙ্কল্পজ কামনা ত্যাগেই সহজাবস্থায় সঞ্চরণ করা যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

সংকল্পপ্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪।
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫।

—৬ষ্ঠ অধ্যায়

বাউলেরা সহজ সাধক, এ কথার প্রকৃত তাৎপর্যটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে বাউল সাধনা বলতে যা বোঝায়, তা কোনো বিশেষ সাধনা বা কর্মমূলক প্রয়াসের নির্দেশ দেয় না, তেমনতর কোনো ইঙ্গিত বা আভাস তার মধ্যে আদৌ নেই। সহজ অবস্থানই সহজ সাধনা। সাধনা বলতে আমরা সাধারণত বুঝি কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলীর অনুবর্তন, কতকগুলি ক্রিয়াবিশেষের সম্পাদন। কিন্তু বাউলের তথাকথিত সাধনা' সেই কর্মভিত্তিক প্রয়াসের সঙ্গে একান্তভাবেই সম্বন্ধহীন।[১] মায়া বিজ্ঞানোত্তর অবস্থায় মোহমুক্তের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। সে হয় স্থিতধী। এই শান্ত, অচঞ্চল অবস্থাই সহজাবস্থা। বাউল এই স্তরে উপনীত। তাই তাকে অভিহিত করা হয় সহজিয়া নামে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় মানুষ এখানে 'মানহুঁস', তখন তার চৈতন্য উদয় হয়েছে। এই অবস্থায় অবস্থানকেই সহজ সাধন নামে বিবৃত

সহজিয়া

১ রাগভক্তি এলে অর্থাৎ ঈশ্বরে ভালবাসা এলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। বৈধী ভক্তি হতেও যেমন, যেতেও তেমন। এত জপ, এত ধ্যান করবে, এত যাগযজ্ঞ হোম করবে, এই এই উপাচারে পূজা করবে, পূজার সময় এই মন্ত্রপাঠ করবে, এই সকলের নাম বৈধীভক্তি। রাগভক্তির কিন্তু পতন নাই। কাদের রাগভক্তি হয়? যাদের পূর্বজন্মে অনেক কাজ করা আছে। অথবা যারা নিত্যসিদ্ধ। যাদের রাগভক্তি, তাদেরই আন্তরিক, ঈশ্বর তাদের ভার লন। —শ্রীরামকৃষ্ণ

করা হয়। সাধনা বলার একটি কারণ এই যে ফলকামনাতেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, সেই ভাব ত্যাগের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। তাই স্থূল অর্থে বা উদার অর্থে সাধনা শব্দটি প্রযুক্ত হয়। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, এ সাধনা যোগপ্রক্রিয়ার অন্তর্গত তান্ত্রিক সাধনা নয়। এ শুধু জ্ঞানপ্রসূত সহজ ভাবাবস্থান। এ অবস্থায় মায়া আর মোহ সৃষ্টিতে সমর্থ হয় না। জীবনে সে সহজ হয়ে বিরাজ করে, ব্যক্তির সঙ্গে তার সহজ সম্বন্ধ।[১] এই কারণেই এই স্তরে উন্নীত ব্যক্তিকে নামাঙ্কিত করা হয় সহজিয়া নামে।

সহজাবস্থা প্রাপ্তি যেমন কর্মভিত্তিক প্রয়াস-সাপেক্ষ নয়, তেমনি সহজ ভাবাবস্থানও কোনো বিশেষ কর্মের অপেক্ষা রাখে না। সহজিয়াগণ সংসারে বাস করে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে। সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আশ্রম সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করে না। তার বিশ্বাস, আশ্রমজীবনের বিশিষ্ট নিয়মাবলীতে আত্মলাভের সুবিধা হয়না, লোকের সঙ্গে সহজ মিলনেই তা লাভ সম্ভব। হংস যেমন জল থেকে ক্ষীরটুকুমাত্র আহরণ করে, জ্ঞানীও তেমনি জনগণের মাঝখানে বাস করেই সত্যসংযুক্ত থাকে। বাউল বলেছে—

আশ্রম

'কারো মন যদি চায় সাধু হতে
ঐ যে রাজহংস সে হয়।'

আত্মার প্রকাশ হলে কোনো আশ্রমে সে আবদ্ধ থাকে না, তাই গীতার উক্তি—

১ আমার জীবনে তুমি আজ শুধু মায়া
সহজে তোমায় তাই তো মিলাই সুরে
সহজেই ডাকি, সহজেই রাখি দূরে
স্বপ্নরূপিনী তুমি
আকুলিয়া আছ পথখোয়া মোর প্রাণের স্বর্গভূমি

—রবীন্দ্রনাথ

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১।

—৬ষ্ঠ অধ্যায়

বস্তুত যোগযুক্তাত্মা তো সমদর্শী। সর্বস্থানে, সর্বভূতে, সে সেই এককেই প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং সঙ্গত্যাগ, স্থানত্যাগ, সঙ্গনির্বাচন, স্থান নির্বাচনের কোনো অর্থই নেই তার কাছে।[১]

আত্মলাভের কর্ম-অসাপেক্ষত্ব সম্বন্ধে বাউলের মতবাদের সত্যতা গীতায় শ্রীকৃষ্ণর উক্তির দ্বারাই প্রমাণিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্নদানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্নতপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮। ১১শ অধ্যায়, গীতা

এই অধ্যায়েই অর্জুনের প্রতি তাঁর বাণী পুনরুচ্চারিত হয়েছে—

সাধন সম্বন্ধে গীতা

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩।

—১১শ অধ্যায়

উপনিষদের ঋষি বলেছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো। ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥

—১।২।৩ কঠোপনিষৎ

১ সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ। ২৯।

—৬ষ্ঠ অধ্যায়, গীতা

যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥৬। —ঈশোপনিষৎ

যতক্ষণ বোধ যে ঈশ্বর সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা তখনই জ্ঞান। —শ্রীরামকৃষ্ণ

উগ্র তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনে নয়, অধ্যয়নদ্বারা পাণ্ডিত্যলাভে নয়, যাগযজ্ঞ ও তান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা নয়, আত্মদর্শন অথবা মুক্তি কোনোটিই মানুষের প্রাকৃত কর্মসম্পাদনের দ্বারা লব্ধ হবার নয়। বাউল ও গীতা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ এক ও অভিন্নমত।

বাউল বাণী

তাহলে প্রশ্ন জাগে, জগতে সাধারণ ব্যক্তির কি কোনো করণীয় নেই? জাগতিক সাধারণ জীবের প্রতি বাউলের কি কোনো বাণী নেই? অবশ্যই আছে। অন্যথায় দর্শন হিসাবে তার গুরুত্ব, তার মূল্য কোথায়?

সে বাণী কী?

বাউল বলে, কর্মের দ্বারা ক্রমানুযায়ী মায়াবিজ্ঞান ঘটে। ব্যক্তি আপন আপন বোধস্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বভাবানুযায়ী কর্ম করে। স্বভাবজ সহজ কর্ম ত্যাগ ক'রে অপরের কর্মানুসরণ নিষ্প্রয়োজন। কারণ, প্রতি ব্যক্তিই আপন আপন কর্মের দ্বারাই সিদ্ধিপথগামী হয় প্রতিমূহূর্তেই।[১] কিন্তু শুধু কি কর্মের দ্বারাই অগ্রসর হতে হবে জীবনের পথে? বাউল এই প্রশ্নের উত্তরে যে কথা বলেছে, জীবন সম্বন্ধে সেইটিই তার বাণী। সে বলেছে শুধু কর্ম নয়, 'বুদ্ধিবিশিষ্ট কর্মই' মানুষকে জীবনপথের পথিক হিসাবে সুখী করে। এই কর্মই তার ঘাত-প্রতিঘাতময় আবর্তসঙ্কুল জীবনে একমাত্র পাথেয়। এই পাথেয়ই জীবনকে সুখাবহ, সুন্দর ও শোভন ক'রে তোলে।

বুদ্ধিবিশিষ্ট কর্ম

বুদ্ধিবিশিষ্ট কর্ম অর্থে কি বোঝায় তা বিশ্লেষণ করা যাক। কর্মে আমিত্ব আরোপই কর্মজীবনকে বিড়ম্বিত ক'রে। অহঙ্কার-সর্প জীবনকে বিষময় করে, ব্যক্তিকে জর্জরিত ক'রে তোলে। কিন্তু বিষামৃতময় জীবনসিন্ধুকে মন্থন ক'রে অমৃতলাভ ঘটে তারই ভাগ্যে

১ যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ১১। ৪র্থ অধ্যায়, গীতা

যে স্বত সাবধানে ঐ অহঙ্কার পঙ্কে নিমজ্জিত না হয়। বাউল বলেছে—

'সেই সাপকে ধরে বশ করেছে
যে জন কৌশলে
কেবল সেই পেয়েছে নিজের হাতে
সোনার মানিক মনোহর।'

অহঙ্কার ত্যাগেই আনন্দের সন্ধান মেলে। ইচ্ছাপূর্তির সঙ্কট থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলেই জীবনের সকল কর্মে একটি শান্ত ছন্দ সঞ্চারিত হয়। বিশ্বের সঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধটি সহজ হয়। জীবনের বীণাযন্ত্রে আর বেসুর বাজে না। বিশ্বছন্দের সঙ্গে তার ছন্দ মিলে গিয়ে একটি গভীর ঐকতানের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির ইচ্ছা যে ভাবের সৃষ্টি করে, তার বিপুল বোঝা জীবনকে ভারগ্রস্ত ক'রে তুর্বিষহ ক'রে দেয়। ইচ্ছাই সমস্যাহীন, সরল, সহজ জীবনকে সমস্যাসঙ্কুল জটিল, কুটীল ক'রে তোলে। তাই ব্যক্তিজীবনের সহজ সাধনা হ'ল স্পৃহামুক্তির সাধনা। তাই আনন্দ। স্পৃহামুক্তিতে সর্বের আবির্ভাব। সর্বাবির্ভূত স্বভাবে সংসার-সংযোগ হলে কেবল মাত্র

'আনন্দরূপমমৃতম্ বিভাতি'

অথচ সংসারে ব্যক্তির স্পৃহা জন্মে। এখানে সংশয় জাগে, স্পৃহাত্যাগ অর্থ তো জীবনকেই ত্যাগ। তাহলে এ ধারণা তো নিতান্ত কাল্পনিক, সত্যের সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বাউল বলে ব্যক্তির পক্ষে এমন অবস্থিতি নিশ্চয়ই সম্ভব এবং এর জন্য কোনও যৌগিক প্রক্রিয়ারও প্রয়োজন হয় না। শান্তমনের দ্বারা সংসারে বিচরণ করলেই সহজ অবস্থিতি হয়। এই কারণেই একে বলা যায় ব্যক্তিজীবনের 'সহজ সাধনা'। এর জন্য কোনো অসহজ ক্রিয়াবিশেষের নৈপুণ্যের দ্বারা আত্মপ্রকাশের কল্পনা নয়। শুধু সচেতনভাবে সংসারে অবস্থান, সচেতনভাবে জগতে বিচরণের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা। বাউল বলেছে—

'চেতন গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর কর ভাই'

বলেছে—

'নয়নযাচা যেজন তারে আনিস না ঘরে
পরাণযাচা রতন তারে ল' গো ল' বরে।
(আমি) দুয়ার খুলি সেই জনারে
যারে চোখে না যায় দেখা।
(আমি) কতই-কি পাই, সবই হারাই
তবে গো না হয় শিখা।
(আমার) যতই বান্ধন ততই কান্দন
এই কি কপালে লিখা।
যাওয়ার যেরে ছাইড়া দেরে রাখিস না ধরে।
বাইরে ঘরে যে জন ভরে তারে ল যাইচা
বসতে তারে আসন দে রে সকল ধন বেইচা।'

সাপেক্ষ-নিরপেক্ষভাবে সংসারে বাস, এই হ'ল বাউল বাণীর মর্ম কথা। এমনতর ব্যাপারের বাস্তব সম্ভাব্যতায় সন্দেহ হতে পারে। প্রশ্ন হতে পারে মায়ার জগতে একি সম্ভব? বাউল দৃঢ়তার সঙ্গে এর উত্তর দিয়ে বলবে, অতি অবশ্যই সম্ভব। কারণ জগৎটা মায়ার হলেও আত্মার স্বাতন্ত্র্য আছে। আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী বাউল তাই ব্যাপারটিকে সম্ভাব্যতার সীমার বাহিরে দেখে না। 'আমির' ঐক্য বিরোধ ও তার ঐক্যে ব্যক্তির অবস্থিতি সম্ভব।

এইজন্য তার বাণী, জীবন সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা হ'ল এই যে, দেহী মাত্রেরই জীবনে কর্ম অপরিহার্য উপাদান। কর্ম দুঃখের নয়,

বাউলের বাণী

দুঃখের মূল নিহিত আছে কর্মের প্রতি ব্যক্তির মনোভাবের মধ্যে। কর্মটাই আমি, এই বোধ ভ্রান্ত, এই ভ্রান্তিই দুঃখের কারণ। কর্ম সম্পাদনে অশান্তি নেই, অশান্তির কারণ নিহিত আছে কর্মে কর্তৃত্বের জ্ঞানে। এই জ্ঞানই মিথ্যা, এটিই অশান্তির কারণ। কর্মের আহ্বানকে স্বীকৃতিদানে

হতাশা নেই, হতাশার বীজ নিহিত আছে কর্মফলের প্রতি লোভের উগ্রতায়, ফল-স্পৃহায়। ফলাসঙ্গই জীবনকে বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত ও বিধ্বংস করে।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

তাই বাউলের উপদেশ, চেতনাকে জাগ্রত রেখে জীবনে অগ্রসর হও।

'সুমজে ভবে সাধন কর'

কারণ

'অচেতনে ঘুমাইলে হারা হবে পিতৃধন'

কর্মের জগতে কর্মপ্রবাহের উত্তাল তরঙ্গাঘাত আসে আসুক, আপন স্বাতন্ত্র্যকে স্মরণ রেখে সে আঘাত সহজে গ্রহণ করো, বিচলিত হয়োনা। সংসারের ঢেউ দেহে লাগুক, অন্তরে তাকে প্রবেশ করতে দিও না। শান্তমনে কর্ম কর, ফলের প্রতি লোভের বশবর্তী হয়ে আন্তর শান্তি ক্ষুণ্ণ হতে দিও না। এটিই সংক্ষেপে সহজিয়া বাউলের সহজ জীবননীতি, জীবনের ধর্ম। বাউলমতে এইটুকু ব্যক্তি-জীবনের সাধনা। ব্যক্তি-জীবনে সংসারের যোগে ভাবের উদয় হয়। পূর্বজন্মার্জিত বুদ্ধি-স্পর্শের দ্বারা বিষয়ের বোধ হয়। সেই বোধে ব্যক্তির প্রকাশ। বোধ হলে বোধ-বিষয়ের মায়ার আবেগ আসে। সেই বেগটাকে জয় করতে না পেরে ব্যক্তিতে সেরূপ বোধকেই 'আমি' বলে মনে করতে হয়। যেমন বিজ্ঞান, সংসারে ঠিক তেমন তৎস্বরূপের অনুমিতি হয়। সেইটাকে আমি বলে মনে হয়। এটিই অহঙ্কার। এটিকে যতদূর সম্ভব ত্যাগ ক'রে বুদ্ধি বিশিষ্ট কর্মপথে অগ্রসর হওয়ার জন্যই সংসারে ব্যক্তির জন্ম। সেই পথগামিতাই বাউলের নির্দেশ। এই নির্দেশই সহজ সাধনা। বাউল এই ধর্মকে সহজে গ্রহণ করেছে। তাকে নিয়ে

ধর্মের বিষয়-কর্ম ফাঁদে নি। তাই এ ধর্ম সরল সহজ ধর্ম, এ সাধনা সহজ সাধনা।[১]

বাউলের বাণী এদেশে নূতন কিছু নয়। এ শুধু ভারত তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দর্শনগ্রন্থ গীতার বাণীর লৌকিক ভাষায় সহজবোধ্য সরল পুনরাবৃত্তি। গীতার শ্রীকৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত জীবনসত্যকেই বাউলকবি সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তি দান করেছে বাঙলার গ্রাম্য ভাষায়। ফলে দেবভাষাবদ্ধ সত্যটি সরল সহজরূপে সুরের মাধ্যমে সর্বজনের হৃদয়ে সহজ প্রবেশলাভের পথ পেয়েছে। বস্তুত বাউলের বাণী ও গীতার বাণী অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

> কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
> স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ। ১৮।৪র্থ অধ্যায় গীতা

কর্মের সঙ্গে যে যোগ সে শুধুমাত্র শারীর যোগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তেমন কর্মে কোনো দুঃখ নেই। তাই ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম সম্পাদনের উপদেশই শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ উপদেশ—

> 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'

শুধুমাত্র কর্ম সম্পাদনের অধিকার জীবের আছে, ফলে তার কর্তৃত্ব নেই। তাই আপন কর্তব্যটুকু সমাধা ক'রে বিশ্ব-বিধানে ঐকান্তিক নির্ভরশীলতা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ম। কর্মের ফললাভ, অথবা চরম আকাঙ্ক্ষিত পরম প্রাপ্তি মোক্ষ, এ সমস্তই দান ধ্যান তপস্যাদি অহংকারনিষ্ঠ-কর্ম-অসাপেক্ষ। তাই গীতার সার কথা, সর্বগুহ্যতম পরম বচন, সমগ্র প্রাচ্য দর্শনের মর্মবাণী—

গীতার মর্মবাণী

---

১ বাহিরে দেখিতে যেমনই হউক, জটিলতাই দুর্বলতা। পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম সেই পরিপূর্ণতার, সুতরাং সরলতার একমাত্র চরমতম আদর্শ। উপনিষদে সেই সরল আদর্শ। ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা। —ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপস্যসি শাশ্বতম্॥

৬২।১৮শ অধ্যায়, গীতা

এবং

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

৬৬। ১৮শ অধ্যায়, গীতা

কর্মের নিমিত্তমাত্র হয়ে এই পরম বিশ্বাসে চরম আত্মনিবেদনই বাউলের সহজাবস্থিতি বা সহজ সাধনা।

এই সহজের কথাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর বিভিন্ন কাব্যে বিচিত্রভাবে—

'সহজ হবি সহজ হবি
ওরে মন সহজ হবি
কাছের জিনিষ দূরে রাখে
তার থেকে তুই দূরে রবি
কেন রে তোর দুহাত পাতা
দান তো না চাই, চাই যে দাতা
সহজে তুই দিবি যখন
সহজে তুই সকল লবি।' —গীতালি

অসহজ হলেই জীবনে বেসুর বাজে। তখন ঘরের আসবাবে ঘরটাকে ছাড়িয়ে যায়, ধনের প্রাচুর্ভাবে মনকে আবৃত করে। ব্যক্তির এ অবস্থা একান্ত শোচনীয়। তখন—

রবীন্দ্রকাব্যেও এই বাণী

'সবচেয়ে যা সহজ সেটাই দুর্লভ তার কাছে।
সেই সহজের মূর্তি যে তার বুকের মধ্যে আছে।
সেই সহজের খেলা ঘরে
ঐ যারা সব মেলা করে
দূর হতে ওর বদ্ধ জীবন সঙ্গ তাদের যাচে।'

—বিচিত্রিতা

প্রাণের নিঝর, স্বভাবের ধারা যখন বিপরীতমুখী টানে অসহজের দিকে গতি নেয়, তখন ব্যক্তির আপন-মাঝে বিদেশে বাস হয়, স্বদেশেই সে পরবাসী। 'আপনাকে তাই খুঁজে বেড়ায় নিত্য আপন-হারা'। বাউলের মতো রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন আপনহারার উদ্দেশে—

'ফলের জন্য নয় তো খোঁজা
কে বইবে সেই বিষম বোঝা
ফল ফললে ধূলায় ফেলে
আবার ফুল ফুটাই।'

বাউল ও রবীন্দ্রনাথ

বাউলগানের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এর তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে উভয়ের সম্পর্কটি কিছু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কারণ অন্যথায় বাউল সঙ্গীতের আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। এই বিশ্লেষণে শুধু যে উভয়ের সম্বন্ধটি পরিস্ফুট হবে এমন নয়, বাউলকাব্যের স্বরূপটি আমাদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে ধরা দেবে। উভয় কাব্যকে পাশাপাশি রেখে নিরীক্ষণের এখানেই সার্থকতা ও অপরিহার্যতা।

রবীন্দ্রনাথও বাউল, এমনতর মত বিশেষ প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ বাউল এমন উক্তিও অনেকে ক'রে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই মতের সত্যতা আদৌ আছে কিনা, এবং থাকলে কতোখানি আছে, তা বিচার্য। রবীন্দ্রনাথকে বাউল বলার অর্থ কী? তাঁর সঙ্গে বাউলের সামঞ্জস্য কোথায়? রবীন্দ্রকাব্য ও বাউলকাব্যের মূলগত ঐক্যসূত্রটি কী? এই প্রশ্নের সুচিন্তিত ও সুস্পষ্ট মীমাংসা প্রয়োজন। তেমনি আবার দেখা দরকার উভয়ের মধ্যে কোনো বৈষম্য বা পার্থক্য আছে কিনা এবং থাকলে তার স্বরূপ কেমন। এই বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা এবং তার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে রবীন্দ্রনাথকে বাউল নামে অভিহিত করার অথবা শ্রেষ্ঠ বাউল আখ্যা প্রদান করার যৌক্তিকতা ও যাথার্থ্য।

রবীন্দ্রনাথও বাউল?

বাউল নামটি ব্যক্তিবিশেষ নয়, পরন্তু সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীবিশেষের প্রতিই প্রযুক্ত হয়, সেকথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। 'বাউল-সাহিত্য' বলতে আমরা যা বুঝি, তা কোনো একটি ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়, একটি সমগ্র গোষ্ঠীর রচনা, একাধিক রচয়িতার রচনা-সমষ্টি। তাই এর স্বরূপ আলোচনায় প্রথমে একটু বিপদে পড়তে

হয়, অবশ্য এ বিপদ নিতান্তই তুচ্ছ। বহুজনার সৃষ্টি বলেই এর মধ্যে ভালোমন্দ, খাঁটি অখাঁটি, গভীর অগভীর সব জাতের রচনাই আছে। এ জিনিষটি লক্ষ্য ক'রেই বাউলগান আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'সকল সাহিত্যে যেমন লোকসাহিত্যেও তেমনি, তার ভালোমন্দের ভেদ আছে। কবির প্রতিভা থেকে যে রসধারা বয়, মন্দাকিনীর মতো অলক্ষ্য লোক থেকে সে নেমে আসে, তারপর একদল লোক আসে, যারা খাল কেটে সেই জল চাষের ক্ষেতে আনতে লেগে যায়। তারা মজুরী করে, তাদের হাতে এই ধারার গভীরতা, এর বিশুদ্ধি চলে যায় কৃত্রিমতায় নানাপ্রকারে বিকৃত হতে থাকে। অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চলে গেছে, তা চলতি হাটের সস্তা দামের জিনিষ হয়ে পথে পথে বিকোচ্ছে। তা অনেক স্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমা তুলনায় আকীর্ণ। এই জন্যই সাধারণত যে সব বাউলগান যেখানে সেখানে পাওয়া যায়, কি সাধনার, কি সাহিত্যের দিক থেকে তার দাম বেশী নয়।'

মিশ্রণ

সুতরাং আমাদের আলোচনায় গতানুগতিকতার অনুবর্তনে, অক্ষম অনুকরণে রচিত তথাকথিত বাউলগানগুলি বাদ দিয়েই যে কথা বলতে হবে, সে বলাই বাহুল্য। আসল এবং নকলের মধ্যে পার্থক্য এতোই সুস্পষ্ট যে গ্রহণবর্জন ব্যাপারটি আদৌ কঠিন নয়।

সে যাইহোক, এই খাঁটি বাউলগানগুলি পাঠ করলে, গানের ভাষা ও প্রকৃতি আলোচনা করলে অথবা তার প্রবণতাটি লক্ষ্য করলে মনে হয় যে এদের রচয়িতা সত্যদৃষ্টির অধিকারী। বাউলকবি সত্যদর্শী।

বাউল ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সত্যদর্শী

রবীন্দ্রনাথও সত্যদর্শী পুরুষ। তাঁর কাব্য সত্যদ্রষ্টার কাব্য। এইদিক থেকে উভয়ের গভীর সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, এবং এই অর্থে রবীন্দ্রনাথকে বাউল আখ্যা প্রদান করলে তা অসঙ্গত বা অযথার্থ হবে না। বাউল ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই মায়াবিজ্ঞানোত্তর

পর্বে উন্নীত বীতমোহ পুরুষ, উদাসীন, নির্বিশেষ, নিরাসক্ত। উভয়েই বিশেষ কর্মসম্পাদনমূলক সাধনায় অবিশ্বাসী। উভয়েই সহজ, এবং ধর্মসাধনায় 'আপনা পথের পথিক'। এই সমধর্মিতাকে ভিত্তি ক'রে রবীন্দ্রনাথকে বাউল বলা চলে। এই সমধর্মিতা লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'কাব আমি ওদের দলে
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন'

—পত্রপুট

কিন্তু উভয়ের গভীর সামঞ্জস্য সত্ত্বেও এ সামঞ্জস্যকে বেশীদূর টানা চলে না। অবস্থাগত বা সুরগত বা দৃষ্টিগত ব্যবধান না থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য প্রকাশগত। অর্থাৎ বৈষম্য ব্যক্তিত্বে নয়, অভিব্যক্তিতে বা প্রকাশে। ব্যক্তিত্ব এক হলেও পার্থক্য আছে প্রকাশভঙ্গীতে। এই প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য উপলব্ধি ক'রেই রবীন্দ্রনাথকে বাউল বলা চলে না। কবির প্রকাশ বিষয়ের বিকাশে, আর বাউলের প্রকাশ ধর্মবিষয়ের বা আত্মভাব লাভের অনুকূল বিষয়ের অভিব্যক্তিতে। রবীন্দ্রনাথ কবি। বাউল দার্শনিক-কবি। সুতরাং বাউলের বিষয় আর রবীন্দ্রনাথের বিষয় এক নয়। একের প্রকাশ ভাবে, অন্যের প্রকাশ ভাবের অনুকূলে।

প্রকাশগত ব্যবধান

তাই রবীন্দ্রনাথ বাউল, এমন কথা খুব জোরের সঙ্গে না বলাই সঙ্গত। 'রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ বাউল' এমন উক্তিও তাই যুক্তিহীন, কারণ রবীন্দ্রনাথ ও বাউলের পার্থক্যটি কবি প্রতিভার উৎকর্ষের দিক থেকে পরিমাণগত নয়, পরন্তু কবি প্রতিভার ধর্ম ও প্রবণতার দিক থেকে গুণগত। এখন এই পার্থক্য অর্থাৎ প্রকাশগত ব্যবধানটি কোথায়, ধর্মগত অসামঞ্জস্যের প্রকৃত স্বরূপটি কি, তাই আমাদের আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথ ও বাউল উভয়েই তত্ত্বার্থদর্শী হলেও কাব্যে অভি-ব্যক্তির ক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র। উভয়ে পৃথক পন্থা অবলম্বন করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যে আমরা পাই সত্যার্থের প্রকাশ। বিজ্ঞানোত্তর পর্বে মুক্তদৃষ্টি কবির সম্মুখে যে সত্য প্রকাশিত হয়েছে, কাব্যে তারই অভিব্যক্তি। এ বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি না দিয়ে কয়েকটি কবিতাংশ উদ্ধরণে বক্তব্যটি সুস্পষ্ট হবে। কাব্যভাণ্ডার থেকে গীতাঞ্জলির কটি উদ্ধৃতি গ্রহণ করি—

'কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।'

কিংবা

'আকাশতলে উঠল ফুটে
আলোর শতদল।
পাপড়িগুলি থরে থরে
ছড়ালো দিক দিগন্তরে
ঢেকে গেলো অন্ধকারে
নিবিড় কালো জল।
মাঝখানেতে সোনার কোষে
আনন্দে তাই আছি বসে
আমায় ঘিরে ছড়ায় ধীরে
আলোর শতদল।'

রবীন্দ্রকাব্য স্বপ্রকাশ

এখানে অভাবাশ্রয়ে কিংবা অভাবকে প্রতিপক্ষ রেখে কাব্যের প্রকাশ ঘটে নি। অর্থাৎ কাব্যের অভিব্যক্তির জন্য কোনও অভাবের উপাশ্রয়ের প্রয়োজন হয়নি। কাব্য এখানে স্বপ্রকাশ বা স্বয়ং-প্রকাশ।

'জড়িয়ে গেছে সরু মোটা
দুটো তারে
জীবন বীণা ঠিক সুরে তাই
বাজে না রে।

এই বেসুরো জটিলতায়
পরাণ আমার মরে ব্যথায়
হঠাৎ আমার গান থেমে যায়
বারে বারে।'

কবিতায় সত্যের সহজ প্রকাশ, তত্ত্ববোধের স্বপ্রকাশ অভিব্যক্তি। সত্যদর্শী হলেও বাউল কিন্তু এমন সোজাভাবে কাব্যে সত্যের প্রকাশ ঘটায় নি। বাউলকাব্যেও সত্যের প্রকাশ আছে, তবে পন্থা তার ভিন্ন। বাউল করেছে মিথ্যার সমালোচনা উপলব্ধ সত্যকে ভিত্তি ক'রে। সত্যকে প্রত্যক্ষ ক'রে, স্বরূপকে আশ্রয় ক'রে, বাউলকাব্যে আছে অসত্য, অস্বরূপের নির্দেশদান। রবীন্দ্রনাথ সহজভাবে সত্যের কথা বলেই ক্ষান্ত। বাউল সত্যের প্রকাশে মিথ্যার সমালোচনা না ক'রে ক্ষান্ত নয়। শুধু তত্ত্বার্থদর্শনে সে তৃপ্ত নয়, কাব্যে তাই অতত্ত্বার্থের প্রকাশপ্রাধান্য। অর্থাৎ কথাটিকে অন্যভাবে বললে দাঁড়ায় এই যে রবীন্দ্রনাথ সত্য প্রকাশ করেছেন সোজাভাবে। আর বাউল মিথ্যার মিথ্যাত্বকে উদ্ঘাটিত ক'রে উল্টোভাবে সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছে। সত্য রবীন্দ্রনাথে স্বপ্রকাশ, বাউলে সে অভাবাশ্রয়ী। অতত্ত্বার্থকে উপলক্ষ রেখে তার অভিব্যক্তি। অর্থাৎ উভয়ের ব্যক্তি বা প্রকাশভঙ্গিমা ভিন্নমুখী। একের পন্থা ইতিমূলক, অন্যের নেতিমূলক। এই অস্বরূপের নেতিমূলক নিরসন-প্রবণতা রবীন্দ্রনাথে নেই।

বাউলকাব্য অভাবাশ্রয়ী, অতত্ত্বার্থের নির্দেশ

বাউলকবি বলেছে—

'ওরে মনকানা তোর ভ্রম তো ঘুচলো না,
ঘরের মধ্যে কে আপন পর
তাও তো চিনলি না।'

কিংবা

'ত্যজিয়ে আসল যে ধন কেন রে মন
স্থদের কারণ টানাটানি
আসলে ত্যাজ্য করে৷স্থদকে ধরে
বড় মুর্খ সেই তো জানি।
স্থদকে ত্যাজ্য কর আসল ধর
থাকিবে ঠিক মহাজনী।'

কিন্তু শুধু নির্দেশ দান বা নিরসন মাত্র নয়, বাউল কাব্যে পাই অসত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ। এর ধর্ম কী, প্রবণতা কোন দিকে, এর প্রকৃত স্বরূপটি কী, তারই আলোচনা বাউল কাব্যে। জগতে এসে দৃষ্টিহারা যে মানুষ কোনটি তার প্রকৃত সত্তা, কোনটি নয়, কে আপন, কে পর তা চেনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, শেষে

'পর কৈনু আপন
আপম কৈনু পর
ঘর কৈনু বাহির
বাহির কৈনু ঘর।'

এমনি অবস্থার সৃষ্টি করে এবং আপন প্রকৃত স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয়ে, সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্লেশ পায়, বাউল আপন কাব্যে তারই সমালোচনা করে। বলে —'আমি আমার চিনলি না মন।' মিথ্যাকে আমি ভেবে যে মানুষ আনন্দ থেকে সরে আসে, মিথ্যা আমির ভ্রমটাকে আঁকড়ে আপনাকে আপনি সুখের বিড়ম্বনায় বিজড়িত করে, বাউল কাব্যে তার ভ্রান্তির প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত। একদেশদর্শী বা একমুখো-দৃষ্টি মানুষকে বাউল তাই বলেছে 'কানা'। জগৎটাই—

অসত্যের স্বরূপ

'যত সব কানার হাট বাজার'

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধ সত্যের প্রকাশ করেছেন, আর বাউল সেই সত্যোপলব্ধির সহায়ক জ্ঞানের কথা বলেছে। সেখানে সত্য সহজভাবে

নেই, আছে সত্য-জ্ঞানের অনুকূল নির্দেশ। বাউলগানে তত্ত্বার্থেরই অভিব্যক্তি নেই, আছে তত্ত্বোপলব্ধির সহায়ক সিদ্ধান্ত।

রবীন্দ্রকাব্য-বাণীতে আনন্দের প্রকাশ। বাউলগানে এমনভাবে আনন্দের অভিব্যক্তি ঘটে নি। আনন্দ তার বাণীতে নয়, সুরে।[১] রবীন্দ্রকাব্য পাঠে যেমন বাউলকাব্য পাঠেও তেমনি হৃদয়ে আনন্দের অনুরণন জাগে, কিন্তু কাব্যের দিক থেকে সে আনন্দ পরিবেশনে পার্থক্য আছে। অর্থাৎ উভয় কাব্যের ফলশ্রুতি এক হলেও প্রকাশ ভিন্নমুখী।

রবীন্দ্রনাথ সত্যের কবি, বাউল দর্শনের কবি। কিংবা বলা যায় রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের[২] কবি, বাউল দর্শনের কবি।

সত্য ও দর্শন

বস্তুত সত্যদর্শী হলেও বাউলকবিকে সত্যের কবি বা সৌন্দর্য্যের কবি কিংবা বাউল কাব্যকে সত্যের বা সৌন্দর্য্যের কাব্য বলা যায় না। কারণ সত্য ও দর্শন একবস্তু নয়।[৩] দর্শনই সত্য নয়। সত্যের পরিবিজ্ঞানের জন্য দর্শন, পরিজ্ঞাত সত্যের প্রকাশে দার্শনিক সত্যের আবশ্যকতা নেই। দর্শন সত্যোপলব্ধির সহায়ক, সত্যপথের নির্দেশক, সত্যলোকে উত্তীর্ণ হবার অনুকূল উপদেষ্টা।

রবীন্দ্রনাথ সত্যের কবি বাউল দর্শনের কবি

সত্যের জন্য দর্শনের প্রয়োজন থাকলেও সত্যের বিকাশে দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিনাশ। সত্যের প্রকাশে সর্বসিদ্ধান্তের ধ্বংস। আর দর্শন সত্য-ভিত্তিক হলেও সত্য দার্শনিক সিদ্ধান্তভিত্তিক নয়। সত্য ও দর্শনে এখানেই ব্যবধান। এবং যেহেতু রবীন্দ্রনাথ সত্যের এবং বাউল দর্শনের কবি, সেইহেতু উভয়ের ব্যবধানও বিরাট।

১ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি 'বাউল গানে কাব্যত্ব' পরিচ্ছেদে।

২ Truth is beauty, beauty truth.

৩ দর্শন পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে বাউল যদি বলা হয়, তবে সে বলা হবে নিতান্তই উদার অর্থে। প্রকৃতপক্ষে প্রকাশের দিক থেকে উভয় কাব্যের সামঞ্জস্য নেই, উভয় সৃষ্টি বিপরীতধর্মী।

বাউল কাব্য একভাব-প্রধান। রবীন্দ্রকাব্য বহুবৈচিত্র্যময়। সংসারে নানা বিষয়। জগতে নানা বৈচিত্র্য। বাউল এই বিচিত্র-ময়তার নিরসন ক'রে শুধু একভাবের নির্দেশ দেয়। ব্যক্তিজগতে এই বৈচিত্র্যের বন্ধন খণ্ডন ক'রে 'একেই বৈচিত্র্যের প্রকাশ'—এই তত্ত্বকে প্রচার করে। এজন্য নিরসন-প্রবণতা হেতু বাউলকাব্যে বৈচিত্র্যময়তা নেই। ব্যক্তির বুদ্ধিপ্রসূত বিভিন্নতার নিরসনে বাউল এক-ভাব-ভাবিত্বের নির্দেশ দেয়। তাই জীবনের বহুত্ববোধ খণ্ডনের দ্বারা একের প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেতে বাউল রচনায় একটি মাত্র সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে সর্বত্র।

অপরপক্ষে রবীন্দ্রকাব্য বৈচিত্র্যময়। কিন্তু এ বৈচিত্র্য অজ্ঞানী ব্যক্তির বিচিত্রবোধের সঙ্গে এক নয়, সে কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এ বহু নিছক বহু নয়। আবৃতজ্ঞান বদ্ধদৃষ্টির যে বৈচিত্রময়তা তা বুদ্ধিপ্রসূত ; আর কবির এই বৈচিত্র্যময়তা বিচিত্রভাবের প্রকাশ। অর্থাৎ আত্মার বিচিত্র প্রকাশের নিবন্ধেই রবীন্দ্রকাব্যে এই বিচিত্রতা। কবি বলেছেন—

'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিনী।'

দ্বিদেশদর্শীর এ বৈচিত্র্যজ্ঞান ভিন্নধর্মী। কবি তাই রূপের মধ্যে অরূপ, সীমার মধ্যে অসীম, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে প্রতক্ষ ক'রে আনন্দ পান।[১] সীমা-জগতের বিচিত্রতার ছবি তিনি আঁকেন, কিন্তু তারই মধ্যে প্রকাশ করেন অসীম একের লীলা। সীমাজগতে বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ থাকায় কবির কাব্যও বিচিত্র-রূপময়।

[১] সংসারী জ্ঞানী কি রকম জান? যেমন সারসীর ঘরে কেউ আছে। ভিতর বার দুইই দেখতে পায়।—শ্রীরামকৃষ্ণ

কাব্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই কাব্যের নাম দিয়েছি 'সংসারসম্বন্ধ-ভাব-ভিত্তি আধ্যাত্মিক কাব্য'।

বাউলকাব্যের মতো রবীন্দ্রকাব্যে সংসারভাবের নিরসন নেই। জীবনের বিচিত্র ছবি, সংসার-ছায়ানাট্যের নানা হাসিকান্না, দুঃখ সুখ, আশা নিরাশার আলোছায়া রবীন্দ্ররচনায় অজস্র বর্ণ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। কাব্য পাঠে পাঠক জীবনের সেই ছবি দেখে, আপন প্রতিবেশ ও পারিপার্শ্বিককে পায়, আপনাকে পায়। জীবনের বিচিত্র রূপের প্রকাশক রবীন্দ্র-রচনা তাই সামাজিকের হৃদয়ে সংবাদ বহন ক'রে যে রসের উদ্বোধন ঘটায়, সে রস বিভিন্ন জনার চিত্তে বিচিত্র সংবেদের সৃষ্টি করে। ব্যক্তিমনের ধর্ম ও প্রবণতা অনুসারে তা ব্যক্তিচিত্তে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ধরা দেয়। একই কাব্য হাজার মনে হাজার রূপে প্রতিফলিত ও প্রতিভাত হয়। কবির ভাষায়—

'বহু জনে লয় তার বহু অর্থ টানি'

বাউলকাব্যে কিন্তু একভাব-প্রাধান্যের ফলে বহু অর্থের সম্ভাবনা বিলুপ্ত।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, রবীন্দ্রকাব্যে তো এমন রচনাও আছে যা সংসারের কর্মবৈচিত্র্যের রূপায়ণ নয়, যা শুধু একের কথা, আত্মার ধ্যান। সেগুলি কি বাউল রচনার সঙ্গে সমধর্মী নয়? উৎসর্গ, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতালি, গীতামাল্য অথবা শেষ পর্যায়ের বীথিকা, পরিশেষ, পত্রপুট, শেষ লেখা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের এক-ভাব-প্রধান রচনাগুলি এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। এ কবিতাগুলি হয় মুক্তি-চিন্তামূলক, নয় আত্মধ্যান-বিষয়ক। রবীন্দ্রকাব্যের সাধারণ রচনার মতো এগুলি 'মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী' নয়। নিমীলিত-চক্ষু কবি এখানে পরম একের বন্দনায় রত। এখানে জগৎ নেই, জীবনের বৈচিত্র্য নেই, সংসারের কর্মকোলাহল নেই। কবির সমগ্র চেতনা অধিকার ক'রে এখানে শুধু পরম এক বিরাজিত।

'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।
বাতাস বহে মরি মরি, আর বেঁধে রেখো না তরী
এসো এসো পার হয়ে মোর হৃদয় মাঝারে॥
তোমার সাথে গানের খেলা দূরের খেলা যে—
বেদনাতে বাজায় বাঁশি সকল বেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি.
আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে॥'

—গানের পারে, গীতিমাল্য

অথবা,

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার'

—অভিসার, গীতাঞ্জলি

কিংবা এই পর্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা, সমগ্র রবীন্দ্ররচনা-জগতের এক বিস্ময়কর গভীরতম উপলব্ধির আশ্চর্য প্রকাশ—

'বিরহের বিষণ্ন আকাশে
সন্ধ্যা হয়ে আসে।
তোমারে নিরখি ধ্যানে সব হতে স্বতন্ত্র করিয়া
অনন্তে ধরিয়া।
নাই সৃষ্টি ধারা
নাই রবি শশী গ্রহতারা;
বায়ু স্তব্ধ আছে,
দিগন্তে একটি রেখা আঁকে নাই গাছে।
নাই কো জনতা,
নাই কানাকানি কথা।
নাই সময়ের পদধ্বনি—
নিরস্ত মুহূর্ত স্থির, দণ্ড পল কিছুই না গণি।
নাই আলো, নাই অন্ধকার,—
আমি নাই, গ্রন্থি নাই তোমার আমার।

নাই সুখ দুঃখ ভয়, আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হ'ল সব,
আকাশে নিস্তব্ধ এক শান্ত অনুভব।
তোমাতে সমস্ত লীন, তুমি আছ একা—
আমি-হীন চিত্ত মাঝে একান্ত তোমারে শুধু দেখা।'

—ধ্যান, বীথিকা

কবি আত্মধ্যান-নিমগ্ন; কবিতা এখানে সংসারভাব-বিষয়ক নয়, আত্মভাবাত্মক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এগুলির প্রকাশভঙ্গিমা বাউলের সঙ্গে এক নয়। কারণ এখানে কবিদৃষ্টি জগৎসীমার পরপারে স্থাপিত বটে, কিন্তু জগতের অনিত্যতাবোধের প্রাবল্য এর সঙ্গে নেই। শুধু বলা যায়, কবি এখানে সংসার-সচেতন নন, আপাতত সংসার-বিস্মৃত। কাব্যের রূপভেদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই শ্রেণীর সৃষ্টিকে 'আত্মসম্বন্ধ-ভাবভিত্তি আধ্যাত্মিক কাব্য' নামে অভিহিত করেছি।

রবীন্দ্রনাথের বাউলগান নামে অভিহিত অথবা ঐ জাতীয় গানগুলির আলোচনায় এ পার্থক্য স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। প্রায়শ্চিত্ত নাটক থেকে ধনঞ্জয়ের একটি গান উদ্ধৃত করি—

'ওরে শিকল, তোমায় কোলে করে
দিয়েছি ঝংকার।
তুমি আনন্দে ভাই রেখেছিলে
ভেঙে অহংকার।
তোমায় নিয়ে করে খেলা
সুখে দুঃখে কাটল বেলা
অঙ্গ বেড়ি দিলে বেড়ি
বিনা দামের অলংকার।
তোমার প'রে করিনে রোষ
দোষ থাকে তো আমারি দোষ
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ংকর।

অহংকারে সারা রাতি
ছিলে আমার সাথের সাথী,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায় করি নমস্কার ॥'

এখানে বাউলের মতো সহজমনের প্রকাশ আছে, কিন্তু নেতি-মূলক নিরসন নেই। রবীন্দ্ররচনা থেকে 'মনের মানুষ' বিষয়ক একটি কবিতা উদ্ধৃত করছি। বিষয়-সামঞ্জস্যে আপাত-সাদৃশ্যের মধ্যে দিয়ে উভয় কাব্যের মৌলিক বৈসাদৃশ্যটি এখানে স্পষ্টতম হয়ে উঠবে।

'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।
সে আছে বলে
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে ;
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে।
সে আছে বলে চোখের তারার আলোয়।
এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়।
সে মোর সঙ্গে থাকে বলে
আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায় দখিন সমীরণে
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পুরে
আনমনা কোন তানের মাঝে আমার গানের সুরে।
দুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে আমারে কাজ ভোলায়।
সে মোর চিরদিনের ব'লে
পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে ॥'

—গীতবিতান

স্পষ্টত এ কবিতা ইতিধর্মী, বাউল রচনার নেতিধর্ম এখানে নেই। তাই রবীন্দ্রকাব্যের তথাকথিত বাউলগানগুলি বস্তুত ট্র্যাডিশনে নেমে আসা বাউল গান নয়। তার রূপ স্বতন্ত্র। সেগুলি স্পষ্টত 'রবীন্দ্র বাউলে'র গান।

বাউল ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের মিল ও অমিল, উভয় কাব্যের

সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য স্পষ্টভাবে পর্যালোচনার চেষ্টা করা গেল। বস্তুত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ও অবহিত ছিলেন বলেই মনে হয়। বাউলগানের আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি একস্থানে যে মন্তব্য করেছেন, তা থেকেই আমাদের অনুমানের সত্যতা নিরূপিত বা প্রমাণিত হবে। তিনি বলেছেন—

'আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের, কিন্তু জাল করতে চেষ্টাও করিনি। সেগুলো স্পষ্টত রবীন্দ্র বাউলের রচনা।'

'রবীন্দ্র বাউল' —উক্তিটি একটি গভীর সত্যের প্রকাশক।

বাউলের মতো রবীন্দ্রনাথও সহজ সাধক। তিনি সহজিয়া। এদিক থেকে তাঁকে বাউল বলা চলে। কিন্তু ব্যক্তিত্বের এই সাম্যকে ভিত্তি ক'রে কবিকে বাউল বলা গেলেও অভিব্যক্তিগত পার্থক্যে তিনি স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন—

'কবি আমি ওদের দলে
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন'

সে ওই অর্থে। অর্থাৎ যে সামঞ্জস্য, ঐক্য বা সমস্তরবর্তিতা সে প্রকাশ বা কবিত্বের দিক থেকে নয়, বোধের বা ব্রাত্যত্বের দিক থেকে। প্রকাশের বিচারে রবীন্দ্রগীতি বাউল নয় রবীন্দ্রনাথও বাউল নন। বাউল যদি একান্তই বলতে হয়, তবে কবির কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও বলতে পারি রবীন্দ্রনাথও বাউল, তবে তিনি 'রবীন্দ্র-বাউল'।

রসিক পাঠকের কাছে একতারা ও বীণাযন্ত্রের তুলনামূলক বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বাউল সাধনা ও বাউল গানের ইতিহাস

জগতের বিভিন্ন কাল বা যুগের বিচিত্র কর্মকে আমরা অনেক সময় এক একটি সূত্রে গ্রথিত ক'রে ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রচনা করি, যার নাম ইতিহাস। নানা কর্মরূপের গ্রন্থনে নানা ইতিহাস জগতে রচিত হয়েছে। ইতিহাস-প্রিয় মন ঐতিহাসিক কৌতূহল নিবৃত্ত না হলে খুশী হয় না; তাই সর্বত্র ঐতিহাসিক পটভূমিকা জানার আগ্রহ অনেক সময় উদগ্র হয়ে ওঠে। এ-মন শুধু বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধিতে সন্তুষ্ট নয়, রূপের ইতিবৃত্ত জানার আগ্রহে উৎসুক। বাউল সাধনা ও বাউলগানের ইতিহাসে তাই অনেকের আগ্রহ।

ইতিহাস

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাউল সাধনার এই জাতীয় কোনো ইতিহাস নেই। কারণ ইতিহাস বস্তুটি কর্মসাপেক্ষ। কর্মের ধারানুসরণে এর সৃষ্টি, কর্মভিত্তিক এর জন্ম। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, ধর্মান্দোলনের ইতিহাস—সমস্তই বিশেষ বিশেষ কর্মের ধারাবাহিক রূপচিত্রণে সৃষ্ট। কিন্তু কর্মের ধারা যেখানে অনুপস্থিত, ইতিহাসের সৃষ্টি সেখানে কী ক'রে সম্ভব? ইতিহাস তো নিরাশ্রয় নয়, কর্মাশ্রয়, কর্মনির্ভর, রূপসাপেক্ষ।

'বাউলের ইতিহাস' শব্দটি তাই অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতো। বাউল সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলবার চেষ্টা করেছি যে বাউল কর্মোপাসক নয়। সে সহজিয়া। তার কর্ম সহজ কর্ম। ফলে কর্মবিশেষে আসক্তি না থাকায় তার কর্মধারারও কোনো বিশেষ রূপ নেই। বৈষ্ণব সম্প্রদায় অথবা শাক্ত সম্প্রদায়ের অথবা অন্য নানা ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস পরিলক্ষিত হয়, তার কারণ উক্ত সম্প্রদায়ের ধর্মসাধনা

ধর্ম সাধনার ইতিহাস কর্ম সাপেক্ষ

কর্মভিত্তিক। জপতপ, নামকীর্তন অথবা তান্ত্রিক বিচিত্র আচার অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করে উক্ত সম্প্রদায়ের সাধনা স্পষ্ট কর্মভিত্তিক রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং একাধিক যুগ ধরে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত উত্তরসাধকেরা পূর্বসূরীর অনুসরণ ক'রে চলেছেন। কখনও একই ধারার গতানুগতিক অনুবর্তন, কখনও বা সামান্য অথবা অসামান্য রূপভেদের ফলে নবতর পরিবর্তনের সূচনা। এমনি ক'রে কর্মধারা নদীর গতিপথের মতো মাঝে মাঝে দিকপরিবর্তন ক'রে নূতন নূতন বাঁকে প্রবাহিত হয়েছে। সেই প্রবাহকে অনুসরণ ক'রেই রচিত হয়েছে ধর্মসাধনার ইতিহাস। কিন্তু বৈষ্ণব বা তান্ত্রিক সাধকদের মতো বাউল সহজসাধকগণের কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রণালী বা চর্যারীতি নেই। এদের সহজ-কর্ম বিশেষ চিহ্নবিহীন। এদের কাজ হাল্কা মনের খুশীর খেয়ালে ভেসে যাওয়া কাজ। তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বা বিধিবদ্ধ প্রণালী নেই। সে পরিকল্পনাবিহীন। তাই অন্য সম্প্রদায়ের মতো এর কর্মসাধনার ইতিবৃত্ত রচনার সম্ভাবনা ও অবকাশ নেই।

পুনরাবৃত্তি হলেও এখানে আবার বলি যে বাউল সম্প্রদায় সৃষ্টিও অন্য সম্প্রদায়-সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্য সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী সৃষ্টি পরিকল্পনাজাত, ইচ্ছাকৃত একটা ব্যাপার। কিন্তু বাউল স্বেচ্ছায় কোনো আচার অনুষ্ঠানকে ভিত্তি ক'রে গোষ্ঠী রচনা করে নি। প্রথমত বাউল আচার অনুষ্ঠানহীন, দ্বিতীয়ত সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী তাদের স্ব-সৃষ্ট নয়, গোষ্ঠীর ভাবটি বাইরে থেকে আরোপিত। বাউলের ব্যবহার দৃষ্টে ও গান শ্রবণে সংসারী মানুষ তাদের 'বাতুল' বা 'বাউল' এই আখ্যা দান করেছে। সুতরাং বাউল কোনো একটি যুগে গোষ্ঠী সৃষ্টি ক'রে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছে, এমন নয়। আর নয় বলেই তার ইতিহাসও অসম্ভব।

বাউল কর্মনির্ভর নয়

সত্যদর্শী বাউল শুধু আপন মনে গান গেয়েছে। সে গানে তার

জীবনদর্শন অভিব্যক্ত। তাই বাউলের প্রকাশ কর্মে নয়, মর্মে। কার্যরূপে নয়, সুরে। বহুবিচিত্র বাউলগানের মধ্যে সেই একই সুর ঝঙ্কৃত।

বাঙলায় নানা কালে নানা দেশে বাউলের আবির্ভাব ঘটেছে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষায় বহু বাউলগান রচিত হয়েছে। বনফুল যেমন এখানে ওখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে ফুটে ওঠে এরাও তেমনি বিভিন্ন কালে বিচিত্র দেশে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বাউল নামটি কবে থেকে এই গায়কদলের প্রতি আরোপিত হয়ে গৌণভাবে সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে, তা নিয়ে গবেষণা ক'রেও অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। ষোড়শ শতকের চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি নানা সাহিত্যে 'বাউল' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু উল্লেখমাত্র ব্যতীত এ সম্বন্ধে কোনো বিস্তৃততর মন্তব্য নেই। সুতরাং সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

'বাউল'-শব্দের প্রথম প্রয়োগ

গানের দিক থেকে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা ক'রে প্রাচীনতম গানের সন তারিখ নির্ণয় ও বাউলগানের আবির্ভাবকাল নির্ধারণ অসম্ভব। কারণ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো এই সাহিত্য শাখাটি লিখিত নয়, অলিখিত, সম্পূর্ণ গেয়। তাই লোকমুখে কালে কালে গীত হতে হতে এর ভাষা ও রূপের পরিবর্তন ঘটেছে অনিবার্যভাবে। ফলে ভাষার প্রাচীনরূপ লুপ্ত হয়েছে বিনিঃশেষে। প্রায় প্রতিটি গান ভাষায় আধুনিকতাগ্রস্ত। এই কারণে গানের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে সাহিত্যের ইতিহাসানুসন্ধান সম্ভাব্যের সীমার অতীত।

ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার অসুবিধা

বস্তুত লিখিত সাহিত্যে প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনেও পদের লেখক-নির্ণয় অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। লিপিকর-প্রমাদ তো আছেই। তাছাড়া একই পদ অনেক সময় একাধিক নামে প্রচলিত

ও প্রচারিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে আনুমানিক সিদ্ধান্ত ছাড়া অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অনেক সময় অসম্ভব। লিখিত সাহিত্যেই যখন এই দশা, যখন সমস্যার সমাধান হয় না, তখন অলিখিত সাহিত্যের কথাই নেই। মুখে মুখে রচিত ও গীত, শ্রুতিস্মৃতিমাত্র যার ধারক, সেই পুঁথিবিহীন গেয় সাহিত্যের লেখকের আবির্ভাব-স্থান, কাল, এমন কি নামের সুনিশ্চিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, একথা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং কে, কবে এবং কোথায় কোন্ গান রচনা করেছে এ কৌতূহল নিবৃত্ত করার উপায় সর্বত্র নেই। এ ক্ষেত্রে নামরূপ বাদ দিয়ে গানরূপটিকে বরণ করলেই যথেষ্ট হ'ল। মহাকালের নৌকায় যে সোনার ফসল এসেছে, তাকে পেয়েই ধন্য হ'ব। কোন্ মাঠে, কোন চাষী সে ফসল ফলিয়েছে, তার হিসাব নাই বা রইল।

কিন্তু আধুনিক কালে আমরা অনেক সময় এ মন্তব্যে সন্তুষ্ট হই না। কাব্যের আন্তর স্বরূপ উপলব্ধি অপেক্ষা বাহিরের ইতিহাস আলোচনায় আমাদের আগ্রহ বেশি। যদিও প্রথমটিই কাব্যের আসল পরিচয় লাভের উপায়। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এক জায়গায় বলেছেন—

সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা

'কাব্যের অন্তরঙ্গের সাধনা ও বহিরঙ্গের সেবা এই দুইটি ক্রিয়ার ভিতর যে শুধু প্রভেদ আছে, তা নয় ; এর একটি প্রযত্ন অপরটির অন্তরায়। কাব্যের ভিতর থেকে ইতিহাস উদ্ধার করতে বসলে দেখা যায় যে কাব্যরস শুকিয়ে এসেছে আর তার ভিতর নিমজ্জিত ঐতিহাসিক উপলখণ্ড দন্ত বিকাশ করে হেসে উঠেছে। ...তবে এরকম ঐতিহাসিক কৌতূহল যখন মানুষের মনে একবার জেগেছে, তখন কাব্যের বহিরঙ্গ পর্যালোচনায় যোগ দেবার প্রবৃত্তি দমন করা অসম্ভব। বিশেষত আধুনিক বিদ্বান ব্যক্তিদের পক্ষে।'

এই ঐতিহাসিক কৌতূহল এতোই তীব্র হয়ে ওঠে যে বাউল সাধনা পূর্ববর্তী কোন কোন সাধনধারার প্রভাবজাত, অথবা

মিশ্রণফল, অথবা বিকৃতরূপ এমন অদ্ভুত প্রশ্নও জাগে এবং তা নিয়েও গবেষণা সুরু হয়। ইতিহাস-কৌতূহলী এই সহজ সত্যটি বিস্মৃত হন যে কোনো সত্য উপলব্ধি বা সত্য সাধনা প্রভাবজাত নয়। একান্ত আত্মগত নিবিড় উপলব্ধি ব্যতীত সত্যলাভ সম্ভব নয়। পরানুকরণের বা প্রভাবের পথে সত্য আসে না। সত্য আপনার অতি প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে, নিবিড়তম অনুভবে। সেখানে 'গুরু বোব, সীসা কাল' অর্থাৎ গুরু মূক এবং শিষ্য বধির। সত্য পথের সন্ধানী 'আপনা পথের পথিক'। অপরের চলা-পথে সসঙ্কোচ পদার্পণে নয়, আপন আবিষ্কৃত পথে নিঃসঙ্কোচ, নিশ্চিত পদক্ষেপে সে প্রাগ্রসর। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাউল সাধনার সঙ্গে গীতা উপনিষদের সাধনার সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু প্রভাবগত সম্বন্ধ নেই। বাউলের সমসাময়িক বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী সাধনা সম্পর্কেও একই কথা। সুতরাং পূর্ব ও সমকালীন বিভিন্ন সাধনধারার সঙ্গে বাউলের সেই সামঞ্জস্য অবলম্বনে ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সে আলোচনা একান্তই বহিরঙ্গ ও অবান্তর।

সাধারণ চিন্তা ও কর্মের জগতে নানা স্থূল প্রভাব ও তারই ধারা অবলম্বনে জাতিকুল নির্ণয় চলে; কিন্তু সত্যোপলব্ধি যেখানে, সেখানে তা একান্তই ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র সুগভীর উপলব্ধির ব্যাপার। প্রভাব বিচার ও জাতিকুল নির্ণয় চেষ্টা সেখানে অসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'সাধারণ লোক পরস্পরের যোগে আপনার পরিচয় দিয়ে থাকে; সে পরিচয় বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ জাতির, বিশেষ সমাজের। পৃথিবীতে এমন লোক অতি অল্পই জন্মেছেন যাঁরা সম্পূর্ণ প্রকাশিত আপন মহিমায়, আপনার সত্যে।'—'বুদ্ধদেব'

বাউলগানেও যে আলোটুকু আছে, তা প্রতিফলিত আলোক নয়, ধর্মান্তর থেকে ধার করা অথবা পাঁচ ধর্মের মিশ্রণের ফল নয়। সত্যসন্ধানী বাউল-মনের দীপাধারে তার জন্ম। এ আলোক

পারিপার্শ্বিক ইতিহাসের ঘটনাচক্রের অনিবার্য ফল নয়। কোনো ইতিহাসের শাসনে এর জন্ম নয়, এর জন্ম আত্মার আর্তিতে, প্রাণের পূর্ণতায়, ব্যক্তিক চেতনার' সীমাহীন বিস্তৃতিতে। সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহুমূল্য উক্তিটুকুর স্মরণ নিচ্ছি—

'আমরা যে ইতিহাসের দ্বারাই একান্ত চালিত, একথা বার বার শুনেছি এবং বার বার ভিতরে ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি। এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে যেখানে আমি আর কিছুই নই, কেবলমাত্র কবি। সেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত। বাহিরের বহুতর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নই। ঐতিহাসিক পণ্ডিত আমার সেই কাব্যস্রষ্টার কেন্দ্র থেকে আমাকে টেনে এনে ফেলে যখন, আমার সেটা অসহ্য হয়।......আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনো ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাঁধে নি। ইতিহাস যেখানে সাধারণ, সেখানে ব্রিটিশ সাবজেক্ট ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল না ; সেখানে রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের বিচিত্র লীলা চলছিল, কিন্তু নারকেল গাছের পাতায় যে আলো ঝিলমিল করছিল, সেটা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রাষ্ট্রিক আমদানি নয়। আমার অন্তরাত্মার কোনো রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে সে বিকশিত হয়েছিল এবং আপনাকে আপনার আনন্দরূপে নানাভাবে প্রত্যহ প্রকাশ করছিল।......সৃষ্টিকর্তা যে, তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু বা ইতিহাস জোগায়, কিছু বা তার সামাজিক পরিবেষ্টন জোগায়, কিন্তু উপকরণ তাকে তৈরী করে না।......একবার কথা ও কাহিনীর' রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাই তার কারণ। তাই তো বলেছে আত্মাই কর্তা। তাকে নেপথ্যে রেখে ঐতিহাসিক উপকরণের আড়ম্বর করা কোনো কোনো মনের পক্ষে গর্বের বিষয় এবং সেখানে সৃষ্টিকর্তার আনন্দকে সে কিছু পরিমাণে আপনার দিকে আহরণ ক'রে আনে। কিন্তু এ সমস্তই গৌণ, সৃষ্টিকর্তা জানে।......সেইটেকেই বড় ক'রে দেখ যে ইতিহাস সৃষ্টিকর্তা মানুষের সারথ্যে চলেছে বিরাটের মধ্যে—ইতিহাসের অতীতে সে,

ইতিহাস ও ব্যক্তি

মানবাত্মার কেন্দ্রস্থলে। উপনিষদের কাছ থেকে আমি যে বাণী গ্রহণ করেছি সে আমিই করেছি, তার মধ্যে আমরই কর্তৃত্ব।'

॥ ২ ॥

বাউলগানের ও বাউলসাধনার আলোচনায় বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এর তুলনামূলক বিচার বা সম্বন্ধ নির্ণয় করার একটু প্রয়োজন আছে। কারণ বাউলধর্ম বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত এবং ঐ ধর্মেরই একটি বিশেষ পরিণতি এই মত অতি প্রচলিত। অনেকে আবার এই মতও পোষণ করতে কুণ্ঠিত নন যে বৌদ্ধধর্মের এক শাখা বিকৃতির ধারা বেয়ে বাউলে এসে পর্যবসিত হয়েছে। শেষোক্ত মতের সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ বাউলগানে অনুপ্রবেশ ঘটেছে এমন পাঠকমাত্রই জানেন যে বাউলের একটি সুপরিস্ফুট, সুস্পষ্ট, সহজ জীবনদর্শন আছে। কোনো বিকৃত দার্শনিক মতের জোড়াতালি অথবা অসহজ অস্ফুটতা এতে নেই।

এখন বাউলদর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধদর্শনের সম্বন্ধ কী তাই বিচার্য। যে কোনো সত্যোপলব্ধি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নিবিড় বোধের ফল, তা পরাশ্রয়ী নয়। বৈষয়িক জগতে বা বাহিরের জগতে অপরের

বৌদ্ধধর্ম ও বাউল

জ্ঞান আমাদের কাজে লাগে, অপরের দান গ্রহণ ক'রে আমরা লাভবান হই ; কিন্তু আত্মিক জগৎ বা আন্তর জগতে অপরের জ্ঞান ও দান আমাদের উপলব্ধি জাগাতে পারে না। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, সেখানে 'গুরু বোব, সীসা কাল'। সে জ্ঞান লাভে 'পণ্ডিত' হওয়া যায়, কিন্তু বোদ্ধা হওয়া অসম্ভব।[১] এক্ষেত্রে সামান্য ফাঁক বা ফাঁকি চলে, এমন পথ

১ দেখ শুধু পড়াশুনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বলতে পারে, কিন্তু হাতে আনা শক্ত। আত্মার দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়। —শ্রীরামকৃষ্ণ

বিধাতা খোলা রাখেন নি। এখানে সকলকেই একান্তভাবে নিজস্ব পথের যাত্রী হতে হয়। তাই একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বাউল সাধক বৌদ্ধদর্শন ও সাধনার স্বতন্ত্র-উপলব্ধিবিহীন ধারক মাত্র নয়। তবে বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে তার ঐক্য আছে। আর সে ঐক্য খুব নিবিড়।

একদা বৈদিক আচার আচরণ, ক্রিয়াকাণ্ড তন্ত্রমন্ত্রের অরণ্যে যখন ভারতবর্ষ পথ হারিয়েছিল, তখন বুদ্ধদেব জ্ঞানের বাণী, আত্মশক্তির বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিশেষ কর্মকাণ্ডের, সাধন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহরূপে। বাউলের সঙ্গে এখানে বুদ্ধমতের গভীর ও ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। সহজ সাধক বাউলও তন্ত্রশাসিত দেশে কর্মকাণ্ডবিরোধী সহজ সুরের প্রকাশ ঘটিয়েছে, যার জন্য তাকে বাতুল নামে অভিহিত করেছে তন্ত্রপন্থী মন। ক্রিয়াকাণ্ডের যুগে যখন কর্মফলনির্ভর আচারপ্রিয় মানুষ আত্মশক্তিকে বিস্মৃত হয়েছিল, তখন ভগবান বুদ্ধ মানুষের নিকট আত্মশক্তি অর্জনেই মুক্তি এই সত্যটিকে জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন। পরমজ্ঞান, অসীম-প্রজ্ঞাই মানুষের ত্রাণকর্তা, কর্মকাণ্ড নয়, এই বাণী বহন ক'রেই তাঁর আগমন। বাউলও আচারের অসারত্ব প্রতিপন্ন ক'রে 'স্বভাব' বা 'চেতন' এর উপর জোর দিয়েছে। বলেছে—

'সর্বদাই চেতনে থাকরে মন'

বলেছে—

'মন যদি না মুড়াইলি, কেশ মুড়াইলি অকারণ।'

কিন্তু বাউল-মত হীনযানী অথবা মহাযানী কোনো একটি যানের সঙ্গে এক নয়। উভয় যানই অনেকটা একদেশদর্শী। হীনযানে আত্মশক্তির সাধনা জ্ঞানের তপস্যাকে একান্ত ক'রে ভক্তিকে নির্বাসিত করেছে, আর মহাযানে ঠিক তার প্রবল প্রতিক্রিয়ায় প্রতিকূল প্রবাহের সৃষ্টিতে ভক্তিকেই সর্বস্ব ক'রে অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের সংযমের অভাব ঘটিয়েছে। কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ই বৌদ্ধের জীবনাদর্শ।

এ সমন্বয় বাউলেরও বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ক'রেই বাউলের প্রশস্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

'তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে।'

জ্ঞান ও ভক্তির এই সুবিহিত, সুসীমিত ঐক্য বাউল দর্শনকে সমসাময়িক অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ ও সাধনপন্থা থেকে স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছে।

এখানে স্বতই এ প্রশ্ন জাগে যে বুদ্ধদেবের বাণী ও বৌদ্ধদর্শন অব্যবহিতভাবে জনসাধারণের মধ্যে গৃহীত হয়ে সারা দেশে ব্যাপ্ত হল এবং তার অতি স্ফীত বন্যাপ্রবাহ আপন ঐশ্বর্যে ভারতের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম ক'রে সুদূর বিদেশে বিস্তৃত হয়ে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ভারতের সৃষ্টি করল, অথচ বাউল-দর্শনের ধারা জনজীবনের সঙ্গে যোগহীন হয়ে আপন সঙ্কীর্ণ গতিপ্রবাহ নিয়ে বয়ে চলল; সংসার তার উদাসীন দৃষ্টিপাতে একবার মাত্র লক্ষ্য ক'রে 'বাতুল' নাম দিয়ে আপন কর্মে রত হল, এর কারণ কী? শ্রীরামকৃষ্ণ এক জায়গায় সুন্দরভাবে বলেছেন—

'বাউলের দল হঠাৎ এল, নাচলে, গান গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গেল। এল—গেল, কেউ চিনলে না।'

বাউলগানের আন্তর সত্যকে অন্তরে স্বীকার করলেও জনগণ আপনার জীবনে তাকে সানন্দে বরণ ক'রে নিল না কেন?

এর উত্তর নিতান্ত সুস্পষ্ট এবং একান্ত সহজ। বুদ্ধদেব আত্মশক্তি-লাভের জন্য জ্ঞানসাধনার কথা বলেছিলেন সত্য এবং ভক্তির কোনো চরম আশ্রয় নির্দেশ করেন নি সত্য, কিন্তু কর্মপ্রসঙ্গকে বর্জন করেন নি। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিশেষ কর্ম নয়, অর্থাৎ আচার নয়। করুণার পূর্ণতা থেকে যে কর্মের জন্ম, সেই প্রেমনিষ্ঠ কর্ম। প্রতি মানুষে মৈত্রীভাব, প্রতি প্রাণীতে প্রীতি। এইখানে বৌদ্ধধর্ম জনজীবনকে স্পর্শ করেছে, আকর্ষণ করেছে, এবং অধিকার করেছে। বুদ্ধদেব 'বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র পড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান ক'রে

মুক্তিলাভ করা যায়', এই বিশ্বাসের অরণ্যে পথ-হারানো মানুষের ঐ বিশ্বাসকেই শুধু আঘাত করেন নি, শুধু ঐ পথের অসারতা উপলব্ধি করিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তিনি আর এক নবতর, মহত্তর পথের নির্দেশ দিয়েছেন, সে পথ প্রেমের, মেত্তিভাবনা বা মৈত্রীভাবনার। স্বার্থ-ত্যাগের দ্বারা, সর্বভূতে অপরিসীম দয়ার দ্বারা আপনার বাসনাকে ক্ষয় ক'রে মুক্তিলাভের পথ। সত্যের এ আহ্বান অমোঘ, তাই একদিন বিপুলা পৃথ্বী এতে সাড়া দিয়েছিল।

কিন্তু সাধক বাউল শুধু অসত্যের সমালোচনা করেছে, এমন কি জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের বাণী উচ্চারণ করেছে কিন্তু কর্মের প্রসঙ্গে জনগণের অনায়াস-গ্রাহ্য কোনো নির্দেশ দান করে নি। অবশ্যই এর অর্থ এই নয় যে বাউল নৈষ্কর্ম্যের সাধক। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে বাউল সহজ-কর্মের কথা বলেছে। বন্ধনহীন, অপ্রমত্ত কর্মের প্রশস্তি গেয়েছে। কিন্তু এই নির্দেশ সর্বজনের সহজ-সাধ্য নয়। তাই জনজীবন এর অনুবর্তী হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'বৌদ্ধধর্মের তিনটি মুখ—বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘ। ধর্মে জ্ঞান, সঙ্ঘে কর্ম ও ও বুদ্ধে ভক্তি। এ তিনের পরিপূর্ণ সম্মিলনেই বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ আদর্শ।'

বাউলে কিন্তু বুদ্ধ ও ধর্ম আছে, সঙ্ঘ নেই। আর সেইজন্যই জনজীবন এর প্রতি বিমুখ।

কথাটিকে অন্যভাবে এবং সম্ভবত স্পষ্টতর ভাবে বলা যায়। বৌদ্ধ ধর্ম ইতিমূলক, বাউল নেতিমূলক। নেতিমূলকতার তত্ত্বকে সাধারণ মানুষ অন্তর জীবনে উপলব্ধি করে, কিন্তু সহজে বহির্জীবনে গ্রহণ করতে পারে না। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে এইখানেই বাউল ধর্মের ভেদ। ঈষৎ অবান্তর হলেও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে রবীন্দ্র মনোধর্মের এ ক্ষেত্রে গভীর ঐক্য আছে। তাই বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের বা দর্শনের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এতো উচ্ছ্বসিত। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বদর্শী, জীবনমুখী মন বুদ্ধদেবের বাণীতে

আপন জীবনের মর্মকথাই আবিষ্কার করেছে। বাউল সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই উৎসাহী, বাউলগানও তাঁর কবিচিত্তকে আকর্ষণ করেছে তার জীবন-সাধনার সহজ-তত্ত্বে।

॥ ৩ ॥

এ প্রসঙ্গে সুফীধর্মের সঙ্গে বাউলের পার্থক্যটিও লক্ষণীয়। সুফী সম্প্রদায়ে গুরুবাদের প্রাবল্য দেখা যায়। অনেকের ধারণা বাউলেরও গুরুবাদ এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাউল দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে যে বিশেষ কোনো গুরুর বিশেষ ক্ষমতায় বাউল বিশ্বাসী নয়।

সুফী ও বাউল

বাউলপদে গুরু বা সাঁই এর উল্লেখ আছে অবশ্যই, কিন্তু সে সুফী সম্প্রদায় বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের গুরুর মতো বিশেষ দীক্ষাদাতা মানুষ নয়। মানুষের অন্তর্নিহিত 'মনের মানুষ'কেই বাউল গুরু বা সাঁই নামে অভিহিত করেছে। বাউলের মানুষ ভজনা কোনো বাহিরের মানুষ নয়, অন্তরলোকের পরম মানুষটির আরতি—

'রাধাশ্যাম কয়, মানুষ ভজ ভাই
মানুষে আছে মিশে।'

অথবা,

'এই মানুষে সেই মানুষ আছে।'

গুরুবাদীরা অনেকসময় এই উক্তির সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন; কিন্তু তা যথার্থ নয়। গুরুবাদ সম্বন্ধে আমাদের এই মন্তব্যের যৌক্তিকতাকে স্পষ্টতর করতে গেলে গুরুবাদের স্বরূপের সামান্য পর্যালোচনা প্রয়োজন।

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই মত

প্রকাশ করেছেন যে গুরুবাদের উৎপত্তির মূলে বৌদ্ধধর্ম নিহিত। তিনি বলেছেন—

'বৌদ্ধধর্মেই সর্বপ্রথম কোনো একজন মানুষকে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি করিয়া দেখা হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি তাঁহার ভক্তদের চক্ষে মানুষের সমস্ত স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়াই যেন প্রতিভাত হইয়াছেন।'

কিন্তু বৌদ্ধধর্মের আদিপর্বে বুদ্ধদেব 'গুরু' হয়ে ওঠেন নি। রবীন্দ্রনাথের মতে 'তিনি যে অসামান্য শক্তিসম্পন্ন গুরু তাহা নহে, তিনি যেন মূর্তিমান অসীমপ্রজ্ঞা, অসীম করুণা।' একজন মানুষের এই বিরাট মূর্তি ধর্মজগতের ইতিহাসে এক বিরাট বিস্ময় ; কিন্তু শুধু মানুষের বিরাটত্ব নয়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। বুদ্ধদেবের উপদেশে প্রজ্ঞার কথা আছে, জীবপ্রেমের কথা আছে কিন্তু মানুষের ভক্তির চরম লক্ষ্যের নির্দেশ অনুপস্থিত। এই নীরবতা উত্তরোত্তর ভক্তচিত্তে নিরালম্ব নিরাশ্রয়তার অস্বস্তিকে প্রবলতর করেছে। তাই সেই শূন্য মন্দিরে স্বয়ং বুদ্ধদেবের প্রতিষ্ঠা ঘটে গেছে মানব-ভক্তির চরম আশ্রয়রূপে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'আমার বিশ্বাস এশিয়াখণ্ডে মানবগুরুকে দৈবশক্তিসম্পন্ন ত্রাণকর্তা বলিয়া পূজা করিবার যে প্রথা চলিয়াছে, বৌদ্ধধর্ম হইতে তাহার উৎপত্তি।'

গুরুবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত অনুমানের সত্যতা সম্বন্ধে মতানৈক্য থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু গুরুবাদের তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর অভিমত যথার্থ। তাঁর মত, 'গুরুর মধ্যে এমন শক্তি আরোপ করা হয়, যাহা মানুষের শক্তি নহে।' এই আরোপণের মূলে আছে অপরপক্ষের

গুরুবাদ

আত্মশক্তির সুকঠিন সাধনাবিমুখ দুর্বল মনের পরাশ্রয়ী বৃত্তি। যার চরমরূপ দেখা যায় এই জাতীয় মত প্রচারে যে পাপী তাপীও গুরুর চরণ শরণ ক'রে উদ্ধার পায়, উদ্ধারের জন্য নিজের করবার কিছু নেই। বলা নিষ্প্রয়োজন দুর্বল ভক্তের এই ধর্মতন্ত্র মানবজীবনে পাপ ও

ক্লিন্নতাকে নিরঙ্কুশ করে। গুরুর এই অধমতারণ রূপ জগতের কল্যাণ আনে না। শিষ্যকে অধঃপাতিত করে, গুরুকেও মাহাত্ম্য দান করে না। বাউল সাধনায় গুরুতন্ত্রের গুরুত্ব নেই। বাউলের গুরু বা সাঁই হৃদয়স্থিত পরমপুরুষ। গুরু এক এবং দ্বিতীয় রহিত।[১]

গুরুবাদেরই আর এক পরিণতি নাম মহিমার প্রাবল্যে। গুরুর অবর্তমানতায় তাঁর নামই ভবসিন্ধুর কাণ্ডারী হয়ে ওঠে, এবং জীবনচর্যা যেমনই হোক ভক্ত বিশ্বাস করে দিনশেষে নামোচ্চারণে সকল পাপ ক্ষালন হয়। বলা বাহুল্য বাউল সর্বপাপহর নামাবলীতে বিশ্বাসী নয়। এই বিশ্বাসকে ব্যঙ্গ ক'রেই সে বলেছে—

'আছে যার মনের মানুষ মনে
সে কি জপে মালা
ও সে নির্জনেতে বসে বসে
দেখেছে খেলা।
কছে রয়ে ডাকে তারে
উচ্চস্বরে কোন পাগেলা!'

কর্তাভজা প্রভৃতি সাধকগোষ্ঠী

বাউল বাঙ্‌লার সমসাময়িক সাধকগোষ্ঠী 'কর্তাভজা' 'নামভজার' সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত নয়। অনেকে বাউলকে এই গোষ্ঠীরই একটি বিশিষ্ট শাখা মনে করেন। এ অনুমান অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত।

১ গুরু সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি বাউলের সঙ্গে তুলনীয়—
গুরু হতে মানুষ পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে—কথামৃত, ২য় ভাগ

গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে। গুরু, কর্তা আর বাবা।

মানুষের কি সাধ্য সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে। যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দ গুরু বৈ আর গতি নেই।—৪র্থ ভাগ

বাউলের সহজ সাধনার সঙ্গে নামভজন বা কর্তাভজনের কোনো সামঞ্জস্য নেই, বরং সম্পূর্ণ বৈপরীত্যই আছে। সুফী সম্প্রদায়ে গুরুবাদের প্রাবল্য যেখানে, বাউলের সঙ্গে সেখানে তার প্রভূত ব্যবধান। বাউলকে বাঙ্‌লার কর্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক পংক্তিভুক্ত করার যে প্রবণতা, তার মূলে রয়েছে বাউল গান সংগ্রাহকগণের প্রকৃত বাউলগান এবং তারই মাধ্যমে বাউলের দর্শন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট, সুপরিস্ফুট ধারণার অভাব। অনেক মিশ্র রচনা ও অ-বাউল গানকে বাউলগান বলে নির্বিচারে গ্রহণ করাতেই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি।

বাউল সম্বন্ধে কোনো কোনো মহলে প্রচলিত আর একটি বিভ্রান্তিকর ধারণার আলোচনা ক'রে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। কেউ কেউ এমন কথা বলেন যে বাউল সাধনার এমন একটি নিগূঢ় তত্ত্ব আছে যা

কেউ যদি আমায় গুরু বলে, আমি বলি দুর শালা, গুরু কিরে! এক সচ্চিদানন্দ বৈ গুরু নাই। তিনিই একমাত্র ভবসাগরের কাণ্ডার।—১ম ভাগ

তুলনীয়—

One is your teacher and all ye are brethren. And call no man your father, which is in Heaven. Neither be ye called masters : for one is your master. (Matt. XXIII 8-10)

স্মরণীয়— উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

৫।৬ গীতা

স্বীয় পৌরুষবলে মন দ্বারা আপনিই আপনাকে পবিত্র পথে নিযুক্ত করা উচিত।—৯৫ সর্গ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে॥

২০।৭।১১ শ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতম্

বাউলেরা সর্বসাধারণকে জানাতে নারাজ। গোপনে, অতি সন্তর্পণে বাউল দুর্গম স্থানে সে সাধনা করে, গানে নাকি সেই গোপন সাধনার নিগূঢ় সঙ্কেত। বলা নিষ্প্রেয়োজন এ সমস্ত কথায় রহস্যের কুহেলিকা সৃষ্টি ক'রে মূঢ়জনের মনে এক ভয়-মিশ্রিত কৌতূহল ও পুলকিত বিস্ময় জাগানো চলে, কিন্তু রসিক মনে, ভাবুক ও বিজ্ঞ মনে এর অসারতা হাস্যকর হয়ে উঠে। বাউল যে সহজজীবন-বিচ্ছিন্ন কোনো বিশেষ সাধন-প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসীই নয়, এ আলোচনা বহুবার করেছি। বাউল গানের দর্শনের ব্যাখ্যায় স্পষ্টভাবে একথা লক্ষগোচর করার চেষ্টা করেছি যে বাউল সাধনার অর্থ সহজ-অবস্থিতি, জীবনের কর্মকে সহজভাবে অন্তরে গ্রহণ। এ ছাড়া বাউলের কোনো সাধনরীতি ও আচারভিত্তিক প্রক্রিয়া নেই। আর নেই বলেই তন্ত্রসাধনার সঙ্গে তার পার্থক্য। বাঙ্‌লার সহজিয়া বৈষ্ণব ও অন্য কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাজাতীয় তান্ত্রিক আচার আচরণ দেখা যায়। হঠযোগ সাধনার বিভিন্ন প্রক্রিয়াও আছে। শারীর-কার্যদ্বারা আত্মলাভের প্রয়াসই এর মূল কথা। আমরা বাউলের ধর্মসাধনা ও দর্শনের বিস্তৃত আলোচনায় দেখেছি যে বাউলে স্বভাব-বিরুদ্ধ কোনো আচার-ভিত্তিক সাধনার অবকাশ নেই। গানের মর্ম বিশ্লেষণে এইকথাটি সুস্পষ্ট হয়েছে যে বাউল অহঙ্কার-ভিত্তিক প্রয়াসের দ্বারা আত্মলাভ হয়, এ কথায় বিশ্বাসহীন।[১] 'বাউল-গানের দর্শন' অধ্যায়ে 'জন্ম', 'ক্রম ও 'সহজাবস্থান' প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং তন্ত্রাচার ও বাউলের সম্বন্ধ বিশ্লেষিত হয়েছে। সুতরাং অকারণ পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রোয়োজন। বৈষ্ণব সহজিয়া ও তন্ত্র সাধনায় নারী সহযোগে সাধনার কথা পাই।

তন্ত্রাচার ও বাউল

---

১ হঠযোগ ভাল নয়। ও সব শরীরের কার্য, ওতে প্রায় ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। হঠযোগী শরীরে কতকগুলা কসরৎ করে। উদ্দেশ্য সিদ্ধাই। দীর্ঘ আয়ু হবে, অষ্টসিদ্ধি হবে, এই সব উদ্দেশ্য।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

'বাঙ্‌লা সাহিত্যে বাউলের স্থান' পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি যে বাউলের সহজিয়া সাধনা নারী-সম্বন্ধবিহীন। বাউলের 'অনুরাগ' বা 'সহজ প্রেম' নারীপ্রেম নয় বা নারীসহ প্রেম নয়। তাই বৈষ্ণবসহজিয়ার নারী সম্বন্ধযুক্ত সাধন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাউলের সাধর্ম্য নেই। তন্ত্রেও বামাচারের উল্লেখ আছে। বাউলের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।[১]

তন্ত্রাচার ও নানা ঘৃণ্য অভিচারমূলক সাধনাকে বাউল সাধনা এবং তারই ইঙ্গিতপূর্ণ গানগুলিকে বাউলগান বলে ভ্রম করা অসঙ্গত। কেননা বাউলিয়া ভাবের সঙ্গে তাকে কোনো ক্রমেই মেলানো যায় না। গান সংগ্রহে ও সংকলনে অসাবধানতাই যে শুধু পাঠক সাধারণের বিভ্রান্তির মূলে তা নয়, অনেক সময় বিশুদ্ধ বাউল গান গুলিকেও বিকৃত ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত করা হয়। সেই সম্প্রদায়িক অর্থ-নিষ্কাশন বাউল-পরিচয়ের বিশেষ বাধা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'অনেক সময় দেখা যায় মানুষ সত্যভাবে যে কথাটা বলে, মিথ্যাভাবে সে কথাটা বোঝে।' —শান্তিনিকেতন

এই বোঝা মহা অনর্থের সৃষ্টি করে।

উপসংহারে সংক্ষেপে বলি যে বাউল যখন কোনো কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী নয়, তখন কর্মকাণ্ড-প্রধান বা কর্মকাণ্ড-ভিত্তিক সাধনধারার সঙ্গে বাউলের যোগ আছে একথা মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। বাউল বৈধীধর্মহীন বা কর্মকাণ্ডবিহীন। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে নৈষ্কর্ম্যের পূজারী সে নয়। সে কর্মকাণ্ডবিহীন, কিন্তু কর্মযোগী। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যাকে কর্মযোগ বলেছেন, বাউল সেই কর্মযোগী। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—

'কর্মযোগ মানে কি জান ? সকল কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ।'

[১] তন্ত্রে বামাচারের কথা আছে। কিন্তু সে ভাল নয়। ভোগ রাখলেই ভয়। —শ্রীরামকৃষ্ণ

কর্মযোগী বাউল তাই কর্মকে সাধনের ভিত্তি করে নি, আবার একে ত্যাগও করে নি। কর্ম সম্পর্কে সে সহজ। অর্থাৎ অনাসক্ত। কথামৃতে পাই—

'এই কর্মে তাঁকে পাওয়া যাবে, আর এই কর্মের দ্বারা পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর কৃপায় উপর নির্ভর করো, তবে তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে কিছু কর্ম করে যেতে হয়।'

ঐ 'কিছু কর্ম করে যাওয়া'—সে কর্ম বিশেষ চিহ্নবিহীন। সে তান্ত্রিক কর্ম নয়, সে সহজ। বাউল সেই সহজ সাধক। সুতরাং সেই সহজিয়া বাউল সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা অর্থহীন ও অবিশ্বাস্য।

আর বাউলের গানে যে বাণী আছে তাকে ধাঁধায় আবদ্ধ ক'রে নিগূঢ় রাখবার কোনো প্রয়াস বাউলের নেই। সহজ প্রাণের সহজ কথা সে সহজ সুরেই বলেছে। নিখিল মানব-সংসারের জন্যই তা উদ্গীত। তার অর্থভেদ কঠিন নয়, দুঃসাধ্য তো নয়ই। কিন্তু শুধু্ অর্থে কী লাভ, 'মর্ম গ্রহণ ক'রে আপন জীবনে যে তাকে বরণ করতে পারে, সে-ই ভাগ্যবান। সাধারণ মানুষ সব সময় তা পারে না। তবু তারা কর্ম-জীবনের অবকাশ-মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য এ গানের বাণী ও সুরের মহিমায় আনন্দ লাভ করে। সে আনন্দ থেকে বাউল কাউকে বঞ্চিত করতে চায় না। আর যে ব্যক্তি বাউলবাণীর মর্মকে জীবনের মর্মে টেনে নিতে চায়, বাউল তাকে এড়াতে চাইবে কোন কৃপণ মনোধর্মে? বাউলের বাণী বিশ্বের সমস্ত সত্যের বাণীর মতোই প্রাণের আনন্দে উদ্গীত, বাধাহীন তার প্রকাশ, অকৃপণ তার দান। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি—

বাউল ও শ্রোতৃসাধারণ

'......সেই সত্য যে শক্তি, যে মুক্তি দিতেছে, সমস্ত মানুষের তাহাতে অধিকার। তাহা সকল মানুষকে আশা দেয়, সাহস দেয়, তাহার ঠিকানা তন্ত্রমন্ত্রের কুয়াশায় ঢাকা নয়, মুক্ত আলোকে সকলের সামনে তাহা বাড়িয়া উঠিতেছে, এবং সকলকে বাড়াইয়া তুলিতেছে।'

বাঙলা সাহিত্যে বাউলের স্থান

বাঙলা সাহিত্যে বাউলের স্থান নির্ণয় করতে যাবার আগে একটি কথা বিশেষভাবে বলে নেওয়া ভালো। বাউল গানের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায়ই 'লোক সাহিত্য' শব্দটি প্রযুক্ত হয় এবং এই প্রযুক্তির দ্বারা সাহিত্যের সাধারণ ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বাউলকে অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র, স্বল্প-পরিসর ক্ষেত্রে স্থাপন করা হয়। কিন্তু আমাদের মতে এই রীতির অনুবর্তনে কোনো যুক্তি নেই। বস্তুত বাউলগানকে শুদ্ধ সাহিত্য না বলে 'লোকসাহিত্য' এই বিশেষণে বিশেষিত করার কারণ আছে বলে মনে হয় না। সাহিত্যজগতে 'লোক সাহিত্য' নামে যে শ্রেণীভেদ তা একান্তভাবেই কৃত্রিম। কোন্‌টিকে শুধু সাহিত্য, আর কোন্‌টিকে লোক সাহিত্য নামে চিহ্নিত করা যাবে, এ সম্বন্ধে সন্তোষজনক মানদণ্ড কোথাও পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে কোন্ সাহিত্য লোকের জন্য নয়? আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবগীতিকা থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রসাহিত্য পর্যন্ত যে সাহিত্য সৃষ্টি, তার মধ্যে লোক ও অ-লোকের পার্থক্য নির্ণয় করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদের দেশে সাহিত্যে এই ভেদ সৃষ্টির প্রয়াস কোনোদিন ছিলও না। শুদ্ধ সাহিত্য এবং লোকের সাহিত্য পৃথকভাবে রচিত হত না, দেখাও হত না। সাহিত্য সকলেরই জন্য, রসাস্বাদন ব্যাপারে এই ধরণের কৃত্রিম অধিকারী ভেদ নেই। বস্তুত 'লোক সাহিত্য' শব্দটি খাঁটি এ দেশীয় শব্দ নয়, এ শুধু ইংরেজী Folk literature এর তর্জমা মাত্র। এদেশে সাহিত্য জগতে এই ভেদ সৃষ্টি একান্তভাবেই অর্বাচীন।

'লোকসাহিত্য' শব্দের প্রয়োগ

প্রয়োগ-বিচার

সব সাহিত্যই লোকের জন্য, তাই সমগ্র সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট শাখাকে লোকসাহিত্য নামে অভিহিত করা উচিত না হলেও

লোকসাহিত্য নামক একটি বিশেষ শাখার বিশিষ্ট নামের উদ্ভব যখন হয়েছে তখন এই নামাঙ্কনের যাথার্থ্যকে একেবারে উপেক্ষা করাও চলে না। তথাকথিত লোকসাহিত্যগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা

লোকসাহিত্যের প্রকৃত স্বরূপ

যায় যে স্থানবিশেষের বিশেষ জীবনচিত্র অথবা বিশেষ সংস্কার অবলম্বনে রচিত এগুলি একশ্রেণীর সৃষ্টি, যার আবেদন সার্বত্রিক নয়, পরন্তু নিতান্ত খণ্ডিত, সীমাবদ্ধ। বিশেষ স্থান বা সংস্কারাশ্রয়ী হওয়ায় এ রচনার রসোপভোগ শুদ্ধ সেই স্থানীয় ব্যক্তি বা সেই বিশেষ সংস্কারবিজড়িত চিত্তমাত্রেই সম্ভব। বস্তুত এই শ্রেণীর রচনার প্রকৃত কাব্যিক মূল্য খুব বেশি নেই। বিশিষ্ট জনসমাজের বিশেষ মনে আনন্দের সঞ্চার করে বলেই একে কাব্য বা সাহিত্য নামে অভিহিত করা হয় মাত্র। আত্মভাব-প্রকাশক আধ্যাত্মিক অথবা আধিদৈবিক কাব্যের কথা বাদ দিয়ে অধিভূতভাবাশ্রিত আধিভৌতিক কাব্যের সঙ্গেও এর তুলনা চলে না। আধিভৌতিক কাব্যে আত্মভাবের প্রকাশ না হলেও সেখানে পাই আত্মভাবানুকূল বিষয়ের অবতারণা। কিন্তু লোকসাহিত্যে তারও পরিচয় মেলে না। এখানে শুধু প্রাদেশিক জীবনের বিশিষ্ট সংস্কারের প্রতিফলন। এ রচনায় আবেগচঞ্চল, অনিয়মিত ইন্দ্রিয়ার্থক মনোবৃত্তির প্রকাশ। অনিয়মিতভাবে ইন্দ্রিয়-বিষয়ের বর্ণনা থাকাতে এগুলি ঠিক সাহিত্য শ্রেণীতে পড়ে না। নিয়মিত ইন্দ্রিয়ার্থক মনোভাবেই ব্যক্তির প্রকাশ। সেই মনোভাবের প্রকাশে অধিভূত কাব্যের সৃষ্টি। সার্বত্রিকভাবে অধিভূতকাব্য কাব্য না হলেও সাংসারিক ক্রমের দিক দিয়ে বিচার করলে এগুলির কাব্যত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। এই অধিভূতভাবের কাব্য মনের নিয়মিত, ন্যায় অন্যায়ের পথ অবলম্বনে প্রকাশিত। সর্বের সংসারে ন্যায়-অন্যায়ের বা ভালোমন্দের স্থান না থাকলেও ক্রমের সংসারে একে উপেক্ষা করার উপায় নেই। ন্যায় অন্যায়ের বিনাশে যে কাব্য সৃষ্টি ক্রমের সংসারেও তার মূল্য নেই। ন্যায়-অন্যায়ের নিয়মিত পথে

যে কাব্যের প্রকাশ নয়, সে কাব্য ক্রমের সংসারেও কোনও কাজের নয়। লোকসাহিত্যে অনিয়মিত পথে ইন্দ্রিয়ার্থক মনোবৃত্তির উল্লাস-মুখর প্রকাশে তাৎকালিক সুখলাভ হলেও শান্তসুন্দর আনন্দের প্রকাশ হয় না। তাই লোক সাহিত্যকে যথার্থ সাহিত্য বলা যায় না। সেখানে মায়াভাবের অত্যধিক স্তুতি।

উদাহরণ হিসাবে এখানে কয়েকটি 'লোক সঙ্গীত' শোনাই। প্রথমে একটি ভাওয়াইয়া গান—

"তেরেষা নদীর ধারে দিদি, মানসাই নদীর পারে
সোনার বঁধু গান গেয়ে যায়, যায় সে অভিসারে।
তোর পানে ও চায় কি দিদি মোর পানে ও চায়
কান পেতে শোন সোনা বন্ধু গান গেয়ে ওই যায়।
বড় বহিন ঢেঁকি পাড়ায় ছোট বহিন ঝাড়ে
গাঙ্গ গড়িছে মেজ বহিন দুই নয়নের ধারে
চোখের জলের ধারা দিয়ে গাঙ্গ সে গড়ি হায়
তোর পানে ও চায় কি দিদি মোর পানে ও চায়।
যায় চলে আর পিছন পানে তাকায় থাকি থাকি
ও দিদি ও যায় যে চলে কেমন করে ডাকি
যায় ছড়িয়ে তুষের আগুন মনের আঙ্গিনায়
তোর পানে ও চায় কি দিদি মোর পানে ও চায়।'[১]

একটি চাষের গান—

'দেইখ্যা যা রে ধানের শীষে
বৃষ্টি রোদের খেলা
দুইজনেতে ঢালছে ক্ষেতে
সোনার মুঠার ভেলা
ঐ সোনাতে কেনবা রে বউ
সোনার বরণী

১ 'কুচবিহারের ভাওয়াইয়া'—কুচবিহার দর্পণ, ১ম খণ্ড ১৯৫০। সংগ্রাহক শ্রীঅমূল্য গুপ্ত।

সওদাগরের মতন জলে
ভাসাব তরণী
ক্ষেতে এমন সোনা।'[১]

বাঁকুড়া জেলার 'তুষলা' বা 'তোষলা' গান—

'এসো পৌষ যেওনা
জনম জনম ছেড়ো না
যদি বা ছাড়বে তুমি
পরাণে মরবো আমি
পৌঝুবি গো এসো
পিঁড়ের উপর বসো।
হবো তোমার দাসী
আনন্দেতে ভাসি।'[২]

অধিভূত-ভাবাশ্রিত রচনাকে যেমন সাহিত্য পদবাচ্য করা চলে, লোকসাহিত্যকে ঠিক তেমন চলে না। উপরে উদ্ধৃত অংশগুলি থেকেই এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে।

এই শ্রেণীর রচনার পরিচিতি মেলে নানা দেশে। আমাদের বাঙলা দেশেও এ সুপ্রচুর। ভাদুগান, তোষলা গান, জারিগান, সারি গান, হাপু গান ইত্যাদি এবং এ ছাড়া চাষের গান, বিয়ের গান, নৌকা বাইচের গান প্রভৃতি বিভিন্ন রূপের বিচিত্র গান আজও অপ্রচুর নয়। কিন্তু বিশেষ জনচিত্তে এর আবেদনকে অস্বীকার না করলেও এ কথাই বলতে হয় যে এ সমস্তই প্রকৃত কাব্য বা সাহিত্য নামের অযোগ্য। বাউল গানকে সাধারণত লোকসঙ্গীত বা লোকসাহিত্য পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করতে দেখা যায়; কিন্তু বাউল সঙ্গীত লোকসাহিত্য এ ধারণা একান্তভাবেই ভ্রান্তিমূলক।

বাউল লোকসাহিত্য নয়

১ নিজস্ব সংগ্রহ

২ বিষ্ণুপুরের চুয়ামসিনা গ্রাম থেকে নিজস্ব সংগ্রহ

বিষয়ের গভীরতা ও প্রতিক্রিয়া-ক্ষেত্রের ব্যাপ্ততার দিক থেকে উপরিউক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকসাহিত্যের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত একে কখনও করা চলে না। বাউলের বাণী ও সুর স্থানবিশেষ অথবা সংস্কারবিশেষের ঊর্ধ্বে। এর সার্বত্রিক মূল্য একে প্রকৃত সাহিত্য বা কাব্যস্তরে উন্নীত করেছে। তাই বাউলগান লোকসাহিত্য এ উক্তি অযৌক্তিক ও অসঙ্গত।

লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত ক'রে বাউল গানকে এইভাবে স্বতন্ত্র রাখার ফলে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সময় স্বভাবতই ইতিহাসকারগণ এর প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টিপাতে বিরত হয়েছেন। ফলে সাহিত্যের ইতিহাস থেকে এমন একটি মূল্যবান প্রসঙ্গ বর্জিত হওয়ায় ইতিহাস তার সামগ্রিকতা হারিয়েছে। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাউলের অন্তর্ভুক্তি ও আলোচনা সাহিত্য হিসাবেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'লোক সাহিত্য' এই শ্রেণী বা গোষ্ঠীর স্বল্পায়তন গণ্ডীর মধ্যে একে সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ সাহিত্যের ইতিহাসকে অপূর্ণ রাখা। সম্প্রতি কয়েকখানি সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে বাউল তার যথাযোগ্য মূল্য পেয়েছে দেখলাম। যেমন বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত-সঙ্গীত, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথের স্থান আলোচনা করা হয়, তেমনিভাবেই

যথার্থ স্থান

বাউলগীতিকার স্থান-নির্দেশ কর্তব্য। সাধারণভাবে সকলেই একে 'লোকসাহিত্যের' পর্যায়ভুক্ত করলেও বাউল বস্তুত 'লোকসাহিত্য' নয়। আমাদের আলোচনার ভূমিকায় ঐ সাধারণ মতকেই আপাত-স্বীকৃতি জানিয়ে 'লোক-সাহিত্য' কথাটি বাউল সম্বন্ধে উচ্চারণ করেছি, তাই এখানে তার প্রতিবাদ করতে হ'ল।

॥ ২ ॥

এখন প্রশ্ন এই যে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাউল গান বা বাউল সাহিত্যের স্থান কোথায়? বাঙলা ভাষার আদিতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্র যুগ পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে রবীন্দ্রকাব্যের পূর্বে একমাত্র বাউল গানই আত্মপ্রভাবিত আত্মভাবমূলক রচনা, যার মূলে দর্শন বা সর্বদর্শন বিরাজমান। এইদিক থেকে সমগ্র বাঙলা সাহিত্যে বাউলই রবীন্দ্রকাব্যের সমধর্মী। উভয় কাব্যই দর্শনমূলক বা দর্শন-ভিত্তিক। অবশ্য ব্যক্তিত্বগত সাধর্ম্য সত্ত্বেও প্রকাশগত বা অভি-ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে। অর্থাৎ আত্মভাবমূলক হলেও রবীন্দ্রকাব্য আধ্যাত্মিক এবং বাউলকাব্য অধিদৈবিক রচনা। 'বাউল ও রবীন্দ্র নাথ' পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু দর্শন-মূলকতার ভিত্তিতে উভয় কাব্য সমধর্মী বা সমস্তরবর্তী। এই সাম্যের জন্যই বাউল কাব্য এতো সহজে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং বাউলগীতির প্রশংসায় কবিকে এমন উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলেছে। শিলাইদহে পদ্মাবক্ষে নৌকাবিহারের সময় প্রায়ই কবির সঙ্গে বিভিন্ন বাউলের সাক্ষাৎ হ'ত এবং বাউলগান শ্রবণ তাঁর নিত্য-কর্ম ছিল। বাউলকবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আপনার গভীর সাম্য লক্ষ্য ক'রেই আনন্দানুভব করেছিলেন। তাঁর আপন স্বীকৃতির ভিতরে এই উক্তির সত্যতা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন—

বাউল ও রবীন্দ্রনাথের দর্শন-গত সমধর্ম

'আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হ'ত।......

আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।'

বাউল পদাবলীর প্রতি কবির এই অনুরাগ সাধর্ম্যমূলক। রবীন্দ্র সঙ্গীতে বাউল সুরের সহজমিলনের মূলেও এই সহজ সাম্য বা ঐক্য।

বাঙলা সাহিত্যে প্রাক্-ভারতচন্দ্রীয় পর্বে অর্থাৎ পূর্বার্ধ বা প্রাচীনযুগে বাউলকাব্য এবং উত্তর-ভারতচন্দ্রীয় পর্বে অর্থাৎ পরার্ধে বা আধুনিক যুগে রবীন্দ্রকাব্য,—দুই যুগের এই দুই কাব্যকেই শুধু তত্ত্বার্থদর্শী সর্বজ্ঞের কাব্য, সর্বদর্শনভিত্তিক অতিলৌকিক কাব্য নামে অভিহিত করা যায়। এই দুই কাব্য ভিন্ন কি প্রাচীন, কি আধুনিক সমস্ত কাব্য সৃষ্টিই অধিভূত ভাবাশ্রিত কাব্য। তাই রবীন্দ্রকাব্যেতর সমস্ত রচনার উপর বাউল কাব্যের উৎকর্ষ। এখানেই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাউল কবি ও বাউলকাব্যের মৌলিক গুরুত্ব।

মৌলিক গুরুত্ব

বাঙলা সাহিত্যের আদিতম সৃষ্টি থেকে বিভিন্ন রচনাগুলির পর্যালোচনাদ্বারা উপরিউক্ত মতের যাথার্থ্য বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত করা যাক।

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক রচিত চর্যাপদগুলিকে অবশ্য আলোচনার ক্ষেত্র থেকে বাদ দিতেই হয়। চর্যাপদগুলির রচয়িতা যে সর্বজ্ঞ ও তত্ত্বার্থদর্শী পুরুষ এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাউলগানের সঙ্গে তার তুলনা চলে না, কারণ চর্যাপদগুলি কাব্য নয়, একান্তভাবে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ দর্শন। বাউল পদাবলী দার্শনিক প্রবণতা সত্ত্বেও সহজ সুরের বর্তমানতার জন্য কাব্যস্তরে উন্নীত হয়েছে, নেতিমূলক নিরসনের প্রাধান্য সত্ত্বেও পরিণামী আনন্দের জন্য কাব্য হয়ে উঠেছে ; চর্যাপদ সম্বন্ধে কিন্তু

একথা আদৌ প্রযোজ্য নয়। কারণ চর্যায় আছে শুধু দার্শনিক সিদ্ধান্তের প্রকাশ, পদে সহজ সুরের সঞ্চরণ নেই, তাই পদপাঠে সত্যতত্ত্বের নির্দেশ পাওয়া যায়, আনন্দলাভ ঘটে না। যদিও প্রতি চর্যাপদের শীর্ষে পটমঞ্জরী, বরাড়ী, মল্লার প্রভৃতি রাগরাগিণীর নামোল্লেখ আছে এবং দশাক্ষরা-বৃত্তি প্রভৃতি অক্ষরসংখ্যা-ভিত্তিক ছন্দের প্রয়োগ ঘটেছে তথাপি চর্যাকে কাব্য নামাঙ্কিত করা চলে না। দার্শনিক সিদ্ধান্তকে এখানে ছন্দের ছকে ফেলা হয়েছে মাত্র। শিক্ষিত সুরের আরোপণে কাব্য রূপ ধরে না, সহজসুরের স্বতপ্রকাশেই কাব্যানন্দ জাগে। কাব্যের বহিরাকৃতির অনুকরণে কাব্যস্বরূপ ধরা যায় না। কাব্যপ্রাণের অভিব্যক্তি রূপে ঘটলেও রূপটাই কাব্য নয়। তাই উপমা, অলঙ্কার ও ছন্দের প্রয়োগ নিখুঁত ও নিপুণ হলেই দেহে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয় না। ছন্দে লেখা হলেও তাই চর্যা আনন্দের উদ্বোধনে অসমর্থ, আর আনন্দ-সম্বন্ধ-রহিত বলেই এ অকাব্য।

চর্যাপদ

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীত্র পইঠা কাল॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিঅই॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখভিতি লেহুরে পাস॥
ভণই লুই আমহে ঝাণে দিঠা।
ধমণ চমন বেণি পিণ্ডি বইঠা॥

রাগ পটমঞ্জরী : লুইপাদানাম্

অথবা—

নিসি অন্ধারী মুসা আচারা।
অমিঅ-ভখঅ মুসা করঅ আহারা॥

মাররে জোইআ মুসা পবণা।
জেণ তুটঅ অবণা-গবণা॥
ভব বিন্দারঅ মূসা খণঅ গাতি।
চঞ্চল-মুসা কলিআঁ নাশক থাতী॥
কাল মুসা উহ ণ বাণ।
গঅণে উঠি করঅ অমিঅ পাণ॥
তাব সে মুসা উঞ্চল—পাঞ্চল।
সদগুরু-বোহে করহ সো নিচ্চল॥
জবেঁ মুসাএর আচার তুটঅ।
ভুসুক ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ॥

রাগ বরাড়ী ঃ ভুসুকু পাদানাম্

এখানে সত্যতত্ত্বের নির্দেশ পাই, কিন্তু অন্তরে আনন্দের উদ্বোধন ঘটে না। সুরসংযোগে গীত হলেও এ গান নয়। কারণ এর অন্তরে সুরের অধিষ্ঠান নেই। তত্ত্ব এখানে ছন্দের ছকে প্রকাশিত। বাঙলা ভাষার আদিতম নিদর্শন হলেও চর্যাকে এই কারণে বাঙলা কাব্যের আদি সৃষ্টি হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

চর্যাপদের পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যের যে রচনাগুলিকে অতি-লৌকিক বা আধ্যাত্মিক সাহিত্য নামে সাধারণত অভিহিত করা হয়, তা হ'ল শাক্ত সাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য। এদের স্বরূপালোচনা ক'রে বাউলকাব্যের সঙ্গে তুলনা করা যাক।

শাক্তপদাবলী প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা। রামপ্রসাদ এই শাখার শ্রেষ্ঠ কবি নামে অভিহিত হন। প্রসাদী গান ও অন্য পদকার রচিত শাক্ত সাহিত্যকে আধ্যাত্মিক সাহিত্য নামে সচরাচর বর্ণনা করা হয়। বস্তুত এই অভিহিতি 'আধ্যাত্মিক' শব্দের লোক-ব্যবহৃত সাধারণ প্রচলিত ভ্রান্ত অর্থে ব্যবহার-সঞ্জাত। দেবদেবী-বিষয়ক রচনাকে প্রায়ই আধ্যাত্মিক রচনার পর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। রামপ্রসাদ প্রমুখ শাক্ত পদকারগণের

রচনাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে রচয়িতার রচনা আত্মপ্রভাবিত, আত্মসংস্থ রচনা নয়। মায়া-বিজ্ঞানোত্তর পর্বে কবিচিত্তে যে আত্মনিষ্ঠ প্রশান্তির ভাব বিরাজ করে, আধ্যাত্মিক কাব্য সেই শান্ত-রসমণ্ডিত, অধ্যাত্ম স্তরের কবির আত্মতৃপ্ত মনের সহজানন্দের অভিব্যক্তি। কিন্তু রামপ্রসাদের রচনায় তার পরিচিতি মেলে না। প্রসাদী গানের আলোচনা করলেই এ উক্তির যুক্তি-ভিত্তি ধরা পড়বে। বস্তুত রামপ্রসাদ উত্তর-বিজ্ঞান যুগের জীবনমুক্ত অক্ষর পুরুষ নন, সাধারণ মোহাভিভূত মানুষ না হলেও তিনি ভক্ত। প্রবৃদ্ধ সাত্ত্বিক অবস্থায় তাঁর অবস্থান। বেদান্ত বলেন—'যথা জ্ঞানং তথা কর্ম যত্তু প্রবচন পরমেব জ্ঞানং তস্য আভাস এব আয়াতি'। প্রবৃদ্ধ সাত্ত্বিক অবস্থায় স্বরূপের আভাস আসে। কিন্তু আভাসই স্বরূপ নয়। তারও স্বরূপ-সিদ্ধির প্রয়োজন। স্বরূপ-সিদ্ধিতে চাঞ্চল্য নেই। প্রসাদী গানের আবেগ চঞ্চল সুর স্বরূপের সিদ্ধান্তে কবির অপ্রবেশকেই সুচিত করে। দৈবী মায়াস্তরে কবির যে আত্মলীনতা-প্রসূত মানস প্রসন্নতা, প্রসাদী রচনায় তার অভাব। রামপ্রসাদের পদাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট এই যে তার মধ্যে ভক্ত-হৃদয়ের ভক্তি বিহ্বলতার অভিব্যক্তি ঘটেছে। বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্রীভূত সত্তাকে শক্তিরূপিনী, মাতৃমূর্তিতে কল্পনা ক'রে কবি তাঁরই পূজা করেছেন গানে গানে। তিনি আউল (আকুল), বাউল নন। এ গানের কাব্যিক মূল্য যদি কোথাও থাকে, তবে সে ঐ ভক্তি বিহ্বল হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে। কিন্তু প্রকৃত আধ্যাত্মিক কাব্য এই জাতীয় উচ্ছ্বাসবিহীন। সত্যদৃষ্টি বিজ্ঞানী কবির অন্তর উদ্বেলতা-হীন, প্রশান্ত। অথচ রামপ্রসাদের পদে একটা উদ্বেগ-চঞ্চল অশান্ত হৃদয়ের আক্ষেপের প্রাধান্য। উদাহরণ স্বরূপ একটি অংশ উদ্ধৃত করি—

রামপ্রসাদ ও শাক্ত সাহিত্য

'ভূতের বেগার খাটিব কত।
তারা বল আমায় খাটাবি কত।

উদ্বেগচঞ্চল অশান্ত আক্ষেপ

আমি ভাবি এক আর হয় এক,
সুখ নাই মা কদাচিত।
পঞ্চদিকে নিয়ে বেড়ায় এই দেহের পঞ্চভূত।
ও মা ষড়রিপুর সাহায্যে তার হ'ল
ভূতের অনুগত।
আসিয়া ভবসংসারে দুঃখ পেলাম যথোচিত॥'

স্বরূপের সিদ্ধি ঘটলে জীবনমুক্ত পুরুষের কাছে সংসারের কাজ ভূতের বেগার নয়। এখানে আত্মকার্য ক'রেই আনন্দের প্রকাশ. আত্মভাবে আত্মার পূজাতেই তৃপ্তিলাভ।[১] এ অবস্থায় মন কর্মনিষ্ঠ থাকে না, থাকে আত্মনিষ্ঠ, আত্মস্থ। তাই কর্মের সঙ্গে লিপ্ততা আসে না। বাউল কবি তাই জাগতিক কর্মকে অস্বীকৃতি জানায় নি এমনভাবে। রামপ্রসাদ গেয়েছেন—

'মা তোমারে বারে বারে
জানাবো আর দুঃখ কত।
ভাসিতেছি দুঃখনীরে
স্রোতের শেহালার মত।

এবং

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি।
কালের হাতে স'পে দিয়ে মা
ভুলেছো কি রাজ মহিষী।'

রামপ্রসাদ যোগী পুরুষ। তাই সাধারণ মানুষের মতো সংসারে

১ 'যেখানে যা পাস
মিটায়ে নে আশ
ফুরাইলে দিস ফুরাতে'
—ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

মত্ত নন। তথাপি মায়ার বিজ্ঞান না হওয়ায় সুখতুঃখের লাভ ক্ষতির বোধ অত্যন্ত উগ্র ও প্রকট। তাই স্বীয় পরিবেশকে সহজ স্বীকৃতি দিয়ে নিজেকে অসম্পৃক্ত রেখে উদাসীন অবস্থায় বিচরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ঔদাসীন্য আসে বিজ্ঞানোত্তর পর্বে, তার পূর্বে নয়। বিজ্ঞানী কবি আত্মস্বাতন্ত্র্যে সচেতন। সংসারে প্রবেশ করলেও সংসার তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে না। তাই সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা নেই। সে মন রাগ বিরাগ উভয়েরই ঊর্ধ্বে।

উপরি উদ্ধৃত প্রসাদী গানের পরে বাউলের উক্তিটি এখানে বিশেষ লক্ষণীয়। বাউল বলেছে—

'ওগো মূলাধার তুমি আপ্নে কর পার
আমি চাহি না নিস্তার।
তুমিই সাগর আমিই তরী তুমিই খেওয়ার মাঝি
কূল না দিয়ে ডুবাও যদি তাতেই পরাণ রাজি।
ওগো তোমা হতে কূল কি বড় ভরম কি আমার।
কূল তুমি হে অকূল গোঁসাই সাগর তবে কে
ওরে তার উপরে লহর গোঁসাই যতই খুশি দে।
আপ্নে যদি ঝুল দিতে চাও, থির চাহি না আর
আপ্নে যা হওনা গোঁসাই নাই তাতে মোর মানা
আরের হাতে সৈপো না গো দেই তোমায় জানা।
আপ্নে রাখ, আপ্নে মার ওগো সারাৎসার।'

—লালন সাঁই

ঠিক এইভাবেই সহজ শান্ত সুরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—

'আবার উঠা বসাতেই বা ক্ষতি কি? জল স্থির থাকলেও জল—আর হেললে দুললেও. জল। ঝড়ের এঁটোপাতা হাওয়াতে যে দিকে লয়ে যায়। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী।'

আবার রবীন্দ্রনাথের কাছেও শুনি—

'সুখে আমায় রাখবে কেন রাখো তোমার কোলে
যাক না সুখ জ্বলে।

যাক না পায়ের তলার মাটি
তুমি যখন ধরবে আঁটি
তুলে নিয়ে দুলাবে ঐ বাহু দোলার দোলে।
যেখানে ঘর বাঁধব আমি আসে আসুক বান
তুমি যদি ভাসাও মোরে চাইনে পরিত্রাণ।
হার মেনেছি, মিটেছে ভয়,
তোমার জয় তো আমারি জয়,
ধরা দেব, তোমায় আমি ধরব যে তাই হলে।'

—গীতালি

যোগবিশিষ্ঠ রামায়ণ বলেন—

'যে ব্যক্তি সর্বভূতে সমদর্শী, তিনি ভাবীসুখের আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং প্রাপ্ত বিষয় পরিত্যাগ করেন না, তিনি প্রকৃত শান্ত।'

বিশ্বসৃষ্টির বিচিত্র লীলাকে প্রত্যক্ষ ক'রে সে সম্বন্ধে উদাসীন কবি রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছেন—

'কতো অজানারে জানাইলে তুমি
কতো ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।'

তখন কাব্যে একটি পরম আত্মতৃপ্ত মনের চরম প্রশান্তির প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু রামপ্রসাদে ধ্বনিত হয়েছে অন্য সুর—

'মা আমায় ঘুরাবি কতো
কলুর চোখ বাঁধা বলদের মতো
ঘানি গাছে বেঁধে দিয়ে মা
পাক দিতেছ অবিরত।'

এখানে অতৃপ্ত চিত্তের অশান্ত আক্ষেপ। রামপ্রসাদের দৃষ্টিতে মর্ত্যে কোথাও মধু ক্ষরিত নয়। পৃথিবীর ধূলি মধুময় হওয়া দূরে থাক, তিনি স্পষ্টই বলেছেন 'মাটিতে পড়ে হলাম মাটি'। বলেছেন—

'আমি ক্ষান্ত হবো যখন আমায়
শান্ত ক'রে লবে কোলে।'

তার পূর্বে শান্তি নেই, তার পূর্ব পর্যন্ত 'মায়ে পোয়ে মোকর্দমা'। শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের এই পংক্তিগুলিই উদ্ধৃত ক'রে একে বলেছেন 'ভক্তির তমঃ'।[১] তাই প্রসাদী কাব্যে অনুযোগ, অনুরোধ, উপরোধ, রাগবিরাগের প্রাচুর্য। প্রসাদী কাব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্টই ধরা পড়ে যে কাব্যের যা মৌলিক উপাদান তা হ'ল কবিচিত্তের 'অশান্ত আবেগ'। এরই প্রকাশ নানাস্থানে নানাভাবে ঘটেছে।

শুধু বিশ্ব তথা কবিহৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগজ্জননীর প্রতি উক্তিতেই নয়, অন্যত্রও এর প্রকাশ লক্ষণীয়। মৃত্যু-বিষয়ক গান-গুলিতে মরণকে কবি সহজ শান্তভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। একটা আবেগ-কম্পিত স্পর্ধার ভাব সেখানে অত্যন্ত প্রকট।

আবেগ

শমনের প্রতি সেই স্পর্ধিত উপেক্ষা কবির অশান্তচিত্ততাকে ব্যঞ্জিত করে। সাধারণ ব্যক্তি-জীবনে মৃত্যুর প্রতি একটা ভীতির ভাব থাকে, মৃত্যু বিভীষিকা। এখানে সে ভীতিকে উপেক্ষা করা হলেও বুদ্ধিপ্রদীপ্ত ব্যক্তিত্বের উগ্র প্রকাশে আত্মভাবের অপ্রকাশ ঘটেছে, সহজভাবে যা ঘটে, সেই ঘটাকে সহজে গ্রহণ করাটাই আত্মভাবিক মনোবৃত্তি। মৃত্যু যদি আসে, সে মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ না ক'রে উপেক্ষা দ্বারা আবেগ প্রকাশে মনের প্রমত্ততা সূচিত হয়, ক্ষতি হয় কাব্যরূপের।

'দূর হয়ে যা যমর ভটা
ওরে আমি যে ব্রহ্মময়ীর বেটা
বলগে যা তোর যমরাজারে
আমার মতন নেছে কটা।'

[১] সত্ত্বগুণে ভক্তি হয়। কিন্তু ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ আছে। পরমহংস তিন গুণের অতীত। —শ্রীরামকৃষ্ণ

কিংবা,

'যা রে শমন যা রে ফিরি
ও তোর যমের বাপের কী ধার ধারি।' ইত্যাদি

বলাবাহুল্য এই অশান্ত আবেগ আত্মসংস্থ মনোভাবের প্রকাশ নয়। এখানে স্মরণীয় ও তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-বিষয়ক কবিতা। জীবন প্রান্তে রচিত 'প্রান্তিকের' একটি কবিতা উদ্ধৃত করি—

'ওরে চিরভিক্ষু, তোর আজন্মকালের ভিক্ষাঝুলি
চরিতার্থ হোক আজি, মরণের প্রসাদ বহ্নিতে
কামনার আবর্জনা যত, ক্ষুধিত অহমিকার
উঞ্ছবৃত্তি-সঞ্চিত জঞ্জালরাশি দগ্ধ হয়ে গিয়ে
ধন্য হোক আলোকের দানে, এ মর্তের প্রান্তপথ
দীপ্ত করে দিক. অবশেষে নিঃশেষে মিলিয়া যাক
পূর্ব সমুদ্রের পারে অপূর্ব উদয়াচল চূড়ে
অরুণকিরণতলে একদিন অমর্ত্য প্রভাতে।' —প্রান্তিক

জীবনের সন্ধ্যাক্ষণে রোগজর্জর কবি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যা অনুভব করেছেন, তার প্রকাশ—

'ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যাত্রার সময় বুঝি এলো,
সময় যাবার
শান্ত হোক, স্তব্ধ হোক, স্মরণ সভার সমারোহ
না রচুক শোকের সম্মোহ।
বনশ্রেণী প্রস্থানের দ্বারে
ধরণীর শান্তিমন্ত্র দিক মৌন পল্লবসম্ভারে।
নামিয়া আসুক ধীরে রাত্রির নিঃশব্দ আশীর্বাদ,
সপ্তর্ষির জ্যোতির প্রসাদ।'

—আরোগ্য

যমের ভয়ে কবি কাতর নন, আবার সে ভয়কে স্পর্দ্ধাভরে অস্বীকার করার উদগ্র আস্ফালনও নেই। মর্ত্যের বন্ধন-ক্ষয়ে শান্ত মনে কবি সম্মুখের শান্তিপারাবারের প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি।

শাক্তসঙ্গীতের অশান্ত আবেগ আত্মসংস্থ মনের পরিচায়ক নয়, একান্তভাবেই বুদ্ধিজড় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। এখানেই শাক্ত সঙ্গীতের আধিভৌতিকতা। তাই এ কাব্যকে ভক্তিমূলক কাব্য নামে অভিহিত করা যায়, আধ্যাত্মিক কাব্য নামে নয়। আধ্যাত্মিক-ভাবে জ্ঞানের প্রকাশ হ'লে জ্ঞান-প্রকাশ ব্যক্তি জ্ঞানের অন্বেষণেই রত থাকে। স্বভাবজাত সর্বসাধনা বুদ্ধি-প্রদীপ্তের স্তুতিবাদ ত্যাগ ক'রে আত্মাতেই লীন হয়। আত্মভাবে আত্মার ভজনা করে। সেখানে কালী দুর্গা শিব মহাদেবের প্রাধান্য নেই। কালী দুর্গার অস্বীকৃতি না থাকলেও তাতেই মন মাতিয়ে তোলার মতো মনের প্রবণতা বা গতি তখন কেটে যায়। রামপ্রসাদ মায়ের ভাবে বিভোল, মায়ের চরণেই মুক্তির উৎস খুঁজে নিতে ব্যস্ত।

'মুক্ত কর মা মুক্তকেশী'

আধ্যাত্মিকভাবে মুক্তি-উৎস মাতৃচরণে নয়, আত্মভাবে আত্মার উপাসনায়। মাতৃপূজার অস্বীকার না থাকলেও মাতৃপূজাতেই মুক্তি নয়। আত্মকার্যে আপনাকে প্রকাশ ক'রে আত্মপথে এগিয়ে চলা, উজিয়ে চলা নয়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

'উজিয়ে যেতে চাই যতোবার
গর্বসুখে
তোমার স্রোতের প্রবল পরশ
পাই যে বুকে।'

একমাত্র মাতৃপদেই মুক্তির উৎস নির্ণয় করা উজিয়ে চলা। যে জীবন উজিয়ে চলে, সে জীবনে আত্মভাবের প্রকাশ নেই। সাংসারিক সুখ দুঃখের গভীরতম আবেগ মিশিয়ে সাংসারিক অসারতার গান গেয়ে গেলেই সাংসারিক সত্যের দর্শন হয়েছে, এমন বলা যায় না। ভাবমুগ্ধ মন সংসারকে অসার কল্পনা ক'রে লোকের মন হরণ করতে পারে, কিন্তু সংসার অসার নয়,

বাউলের উৎকর্ষ

অসার কল্পনাটাই ভাবমুগ্ধ মনের সৃষ্টি।[১] তাই রামপ্রসাদ ব্যক্তি-জীবনের অসারতা সম্বন্ধে ভাববিহ্বল সুরে গান করলেও সেই গানের আধ্যাত্মিকতা স্বীকার করা যায় না। রামপ্রসাদ বলেছেন 'এ সংসার ধোঁকার টাটী'। এ মন্তব্য সত্যদর্শীর মন্তব্য নয়। জ্ঞানের উদয়ে সংসারের স্বরূপ বিজ্ঞাত হয়। তখন দেখা যায় সংসার-ত্যাগের আবশ্যকতা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন—

'সাধনের সময় এই সংসার ধোঁকার টাটী আবার জ্ঞান লাভের পর, তাঁকে দর্শনের পর এই সংসার মজার কুটী'

তাই প্রসাদী গানের কাব্যত্ব অধিভূত ভাব জ্ঞাপনে, আত্মভাব প্রকাশে নয়। রামপ্রসাদের কাব্য আধি-ভৌতিক কাব্য, অতি-লৌকিক কাব্য নয়। একে ভক্তিমূলক দেবী প্রশস্তি-কাব্য বলা যায়, আধ্যাত্মিক কাব্য বলা চলে না। সুতরাং অতিলৌকিক কাব্য বাউলের আপেক্ষিক উৎকর্ষ অবশ্য স্বীকার্য।

বাউলের সহজিয়া তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে তথাকথিত বৈষ্ণব সহজিয়া পদের আলোচনা প্রয়োজন। বৈষ্ণব সহজিয়া পদে বৈষ্ণবদের সহজিয়াবাদ নামে যা প্রচলিত, তাকে বাউল সহজিয়াবাদের সঙ্গে সমগোত্রীয় বা সমবিষয়ক মনে করলে সেটা হবে মস্ত ভ্রম। বস্তুত বৈষ্ণব সহজিয়াবাদ বাউলের সহজতত্ত্বের সঙ্গে একান্তভাবেই সম্পর্ক-হীন। বাউলের সহজবাদ দর্শন পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। সহজাবস্থান বা নির্লিপ্ত উদাসীনের আসনে আসীন থাকাকেই বাউলকাব্যে সহজাবস্থানরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বাউলের সহজ প্রেম বা অনুরাগ অহংকারশূন্য সহজাবস্থিতিরই নামান্তর মাত্র।

---

১ জগৎ মিথ্যা কেন হবে? ও সব বিচারের কথা। তাঁকে দর্শন হলে তখন বোঝা যায় যে তিনিই সব হয়েছেন। —শ্রীরামকৃষ্ণ

যাবৎ এইরূপ জগৎ বিদ্যমান, তাবৎ মুক্তিলাভ হয়না, অনর্থক প্রলাপ-বাক্যের ন্যায়' 'ইহা নাই, এই সকল অলীক' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিলে দৃশ্যবোধরূপ ব্যাধির শান্তি হয় না। অধিকন্তু তাহা বৃদ্ধি পায়। কেননা এই সকল মৌখিক বাক্য মানসিক বিক্ষেপের জনকই হয়।

—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

'অনুরাগী জ্যান্তেমরা মরার আগে সেই মরেছে'

সহজ পুরুষ বাউল এই অর্থে প্রেমিক বা অনুরাগী। বলা বাহুল্য এই প্রেমের সঙ্গে নারী প্রেমের কোনো সম্বন্ধ নেই। অপরপক্ষে বৈষ্ণব পদাবলীর সহজ প্রেম নারী সম্বন্ধ-যুক্ত, সহজ প্রেম নারী-প্রেম। চণ্ডীদাস ও রজকিনী রামীর প্রেমোপাখ্যান বর্ণনা 'সহজ প্রেম' আখ্যা লাভ করেছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। সুতরাং বাউলের সহজিয়াবাদ ও বৈষ্ণব সহজিয়াবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। উভয়ের মর্মগত কোনো সাদৃশ্যই নেই। সুতরাং 'সহজিয়া' এই নামের সাম্যে উভয়ের সাম্য কল্পনা অর্থহীন।

বৈষ্ণব সহজিয়াবাদ

সে যাই হোক বিষয়বস্তুগত সাধর্ম্য না থাকলেও উভয়কাব্যের মধ্যে আপেক্ষিক উৎকর্ষ বিচার চলে। বিচার ক্ষেত্রে প্রধান প্রশ্ন এই যে বৈষ্ণব সহজিয়া ও রাধাকৃষ্ণ প্রেম-বিষয়ক কাব্যকে আধ্যাত্মিক কাব্য বা সহজের কাব্য বলা চলে কিনা। এ প্রশ্নের উত্তরের উপরেই নির্ভর করবে উভয় কাব্যের মান নির্ণয়। 'সহজ' প্রেম এই বিশেষণের মাধ্যমে অন্তত এই প্রতিপন্ন হয় যে বৈষ্ণব পদকারগণ কাব্য-বর্ণিত প্রেমকে আধ্যাত্মিক-প্রেম অর্থাৎ আত্ম-প্রভাবিত প্রেম বলে দাবী করেন। কারণ আধ্যাত্মিক প্রেমই সহজ প্রেম। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ প্রেমকাব্যও আধ্যাত্মিক কাব্য নামে অভিহিত।

মায়ার জগতে মায়ামুগ্ধ ব্যক্তির আচার আচরণ, বচন বাচন সমস্তই মায়া প্রভাবিত। মুগ্ধজন আপন আপন সংস্কারানুযায়ী কর্ম করে। প্রতিজনের সংস্কার ভিন্ন, তাই আচারও ভিন্ন। এজন্য ব্যক্তি-ভেদে অভিব্যক্তিভেদ। কিন্তু মোহাতীত অবস্থায় উত্তীর্ণ হলে ব্যক্তির অন্তরে সর্বভাব বা আত্মভাবের উদয় হয়। দৈবমায়ান্তরে সাংসারিক সত্যের উপলব্ধি ঘটে। এই সত্য-রূপের প্রকাশেই অধ্যাত্মজীবনের প্রকাশ, অধ্যাত্মজীবনেই অধ্যাত্মপ্রেমের অভিব্যক্তি।

অধ্যাত্ম প্রেম

দৈবমায়ায় ব্যক্তি সংসারভাবে উদাসীন। সেখানে সংসারের অস্বীকৃতি নেই, কিন্তু সংসারে বাস ক'রে সংসারভাবে অনাসক্ত ব্যক্তি আত্মার অন্বেষণে নিযুক্ত, আত্মধ্যান-নিমগ্ন। রূপ ভোগে তার প্রবণতা নেই। কর্মে তার আগ্রহ নেই। শুধু আত্মার নির্দেশে সে কর্মনিযুক্ত। সে কার্য আত্মকার্য কার্যকালে মাত্র কর্মরত এবং নিস্পৃহ বলেই জটিল কর্মচিন্তার স্থান নেই এ অবস্থায়। মোহাভিভূত জীব যেমন সম্পাদিত বিগত অতীত কর্মের পর্যালোচনা করে, বর্তমান কর্মে আসক্ত হয় এবং অনাগত ভবিষ্যতের অনারব্ধ কর্মের পরিকল্পনা করে, স্বপ্ন দেখে, দৈবীমায়াস্তরে সর্বজ্ঞ পুরুষ তেমন করেন না। মোহমুগ্ধের সঙ্গে মোহমুক্তের জীবনের এখানে ব্যবধান। অধ্যাত্মপ্রেমে তাই একদিকে যেমন রূপধ্যান নেই, অন্যদিকে তেমনি নেই জটিল কর্মচিন্তা। এ প্রেম কর্মচিন্তামূলক ও রূপধ্যানজ নয়, আত্মনির্দেশে এর প্রকাশ। অধ্যাত্মপ্রেমী আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন, রূপধ্যানে ও রূপভোগে তার বিরাগ। ভোগ-কামনাবিহীন পরস্পর মিলনে পরস্পরের পরম পরিতৃপ্তিই অধ্যাত্ম-প্রেম। ভোগলোলুপতায় অধ্যাত্ম প্রেম নয়, প্রেমের পরিণামে ভোগ। আত্মকার্যে পারস্পরিক প্রেমবিলাস। তাই নরনারীর এই আত্মপ্রভাবিত প্রেমে আত্মকার্যপ্রযুক্ত মনে পারস্পরিক প্রেমের উদয়, পরিণামী ভোগের অন্তে মনের আত্মায় স্থিতি। এ প্রেমে পরস্পরের মিলনে যে আনন্দ তার মূলে দৈহিক সৌন্দর্য নয়, দেহ সৌন্দর্য দর্শনে মনে আনন্দের সৃষ্টি হয় না, সম-আত্মিকতাই আনন্দের মূলে। আত্মার পূজারী যে, সে নারীরূপ-লালনে বিরত। আত্মার নির্দেশে এ প্রেমের উদয়, তাই এ প্রয়াস-সাপেক্ষ নয়। সাহজিকতাই এর প্রধান লক্ষণ। এখানে প্রেমী আত্মসংস্থিত। ফলে একদিকে যেমন এ প্রেম আনন্দের উচ্ছ্বাসবিহীন, অন্যদিকে তেমনি বিষাদের তীব্রতাহীন। অসাপেক্ষ, স্বয়ংসম্পূর্ণ এই প্রেম শান্ত, সদানন্দময়, নিরুদ্বেগ, অপ্রমত্ত।

অধ্যাত্ম প্রেমের অনির্বাণ শিখা অকম্প্র, অচঞ্চল। সংক্ষেপে এই হ'ল অধ্যাত্মপ্রেমের স্বরূপ।

এখন বৈষ্ণব কাব্যে যে প্রেমের বর্ণনা পাই, তার স্বরূপ কেমন তাই দেখা যাক। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসাদি শ্রেষ্ঠ পদকারগণের পদাবলী থেকে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করি।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম

'লোচন চপল বদন সানন্দ।
নীল নলিনীদলে পূজল চন্দ॥
পীন পয়োধর রুচি উজরী।
সিরিফলে ফললি কনক খঁজরী॥
গুণমতি রমণী গজরাজ গতি।
দেখলি মোয়ঁ জাইত বর জুবতী॥
গুরু অনিতম্ব উপর কুচভার।
ভাগিবাকে চাহঅ থেহিবাকে পার॥
তনু রোমাবলি দেখি এ ন ভেলি
নিজ ধনু মনমথে থেঘ ন দেলি॥
সম্ভ্রম সকল সখীজন রারি।
প্রেম বুঝওলক পলটি নিহারি॥
আন্তর চতুরপন কহহি ন জাএ।
নয়ন নয়ন মিলি রহলি নুকাএ॥
তখন সঁয় চাঁদ চঁদন ন৷সোহাব।
অবোধ নয়ন পুনু তঠমাহি ধাব॥'

পূর্বরাগ, শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, বিদ্যাপতি

চণ্ডীদাস রচিত পূর্বরাগ পর্যায়ের একটি পদ উদ্ধৃত করি। এটিও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

'থীর বিজুরি বরণ গোরি
পেখলু ঘাটের কূলে।
কানড় ছন্দে কবরি বান্ধে
নবমল্লিকার মালে॥

সই মরণ কহিলু তোরে।
আড় নয়নে ঈষত হাসিয়া
আকুল করিল মোরে।

ফুলের গেডুয়া লুফিয়া ধরয়ে
সঘনে দেখায় পাশ।

উচকুচযুগ বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস॥

চরণকমলে মল্ল তোড়ল
সুন্দর যাবক রেখা
কহে চণ্ডীদাস হৃদয় উল্লাসে
পালটি হইবে দেখা।'

শ্রীরাধার উক্তিও অনুরূপ। সেখানেও শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনার প্রাধান্য। শ্রীকৃষ্ণের 'অভিনব জলধর সুন্দর দেহ', 'পীত বসন', 'কুটিল কেশ' প্রভৃতির বিবৃতি। রাধা বলেছে—

'কি কহব রে সখি কানুক রূপ'

উপরে উদ্ধৃত পদগুলি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এ প্রেম রূপধ্যানজ; অধ্যাত্মপ্রেমে রূপের অস্বীকৃতি নেই, কিন্তু দৃষ্টি রূপে থাকে না, থাকে আত্মায়। তাই দেহের প্রতি চোখ পড়লেও তা সামগ্রিক ভাবে আত্মার অভিব্যক্তি হিসাবেই দেখা দেয়। সামগ্রিকতা-বিচ্ছিন্ন দেহাবয়বের স্থানবিশেষে আসক্তি জন্মে না। অথচ উপরে উদ্ধৃত পদে তারই প্রাচুর্য। সমগ্রকে ছাড়িয়ে অংশবিশেষের সৌন্দর্য দর্শন ভোগাসক্তির পরিচিতি। এই রূপধ্যাননিমগ্ন, আবেগ-চঞ্চল, ভোগ-লোলুপ অশান্ত আক্ষেপ অধ্যাত্মপ্রেমের বিষয় নয়। অথচ পদাবলীর প্রেম এই অশান্ত আক্ষেপপ্রসূত। নায়কপদে নায়িকার উক্তি শুধু ভোগাকুল বিকল মনের বিবশতাকেই

প্রকাশ করে।[১] যে প্রেম ভোগবিহ্বল, তাকে আধিভৌতিক ছাড়া আর কী বলা যায় ? অধ্যাত্মপ্রেম রূপপূজারী নয়।

অধ্যাত্মপ্রেমে 'বয়ঃসন্ধি' বর্ণনার স্থান যে আদৌ নেই, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পদাবলীতে শুধু বয়ঃসন্ধি নয়, পূর্বরাগ, বিরহ, মিলন প্রভৃতিতে রূপপ্রাধান্য, আবেগ চাঞ্চল্য। সহজ প্রেম আত্মনির্দিষ্ট, তাই সে পূর্বরাগের ভূমিকাবর্জিত। সেখানে রূপানুরাগ নেই, আক্ষেপ বিক্ষেপের স্থানমাত্র নেই, বিরহজ্বালার অবকাশ নেই। আত্মার নির্দেশে তার উদয়, নির্লিপ্ত তার কর্ম, কর্মান্তে সে আত্মসংস্থ। সেখানে মিলনানন্দের অশান্ত স্মৃতিপর্যালোচনা নেই, অপ্রাপ্তির আক্ষেপ নেই, পুনর্মিলন জন্য কল্পনা নেই, বিচ্ছেদের হাহাকার নেই। এ সমস্তই মুগ্ধ মনের ক্রিয়া, বিবশ প্রাণের অভিব্যক্তি। বিবশ প্রাণের ব্যাকুলতা, বিকল মনের আবেগ, বিলাসের চাঞ্চল্য আধ্যাত্মপ্রেমে নেই। বিবশতা আধিভৌতিকতার লক্ষণ।

পদাবলীর রচনা আধিভৌতিকতার লক্ষণযুক্ত। বস্তুত অধ্যাত্ম-স্তরে উপনীত না হলে অধ্যাত্মকাব্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। মায়াজ মনের আবেগ-বশবর্তী রচনায় যে চাঞ্চল্যকর বাণীর বার্তার সৃষ্টি হয়, চাঞ্চল্যেই তার পরিণতি। অধ্যাত্মকাব্যের পাঠক-হৃদয়ে যে প্রতিক্রিয়া, তা চাঞ্চল্যবিহীন। মনের উদ্বেগ নাশ ক'রে ক্ষণিকের জন্যও প্রশান্ত আনন্দের আভাস দানই তার কাজ।

কৃষ্ণপ্রেম অধ্যাত্মপ্রেমেরও উপরিস্তরের বস্তু। পদাবলীর প্রেমে কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ তো নেই-ই, আধ্যাত্মিক প্রেমেরও নয়। একে আধ্যাত্মিক প্রেম বলে ব্যাখ্যা করার মূলে রয়েছে ব্যাখ্যাতাদের

[১] অপরূপ তুয়া মুরলী ধনি।
লালসা বাঢ়ল শব্দ শুনি॥
কিরূপে এ রূপ দেখিয়া সেহ।
উদবেগে ধনি না ধরে দেহ॥ —জ্ঞানদাস

আধ্যাত্মিক প্রেম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা। সে ধারণা হ'ল এই যে দেহ-সম্বন্ধহীন দেহজ-প্রেমের বর্ণনাতেই অধ্যাত্মপ্রেম। কিন্তু অধ্যাত্ম-প্রেম দেহসম্বন্ধহীন নয়, কারণ দেহ আত্মারই অভিব্যক্তি। কিন্তু সে প্রেম দেহজ নয়। তার দৃষ্টি রূপে নয়, আত্মায়। প্রেম অরূপ, তাই তার অভিব্যক্তির জন্য রূপের আধারের প্রয়োজন। দেহ সেই আধার। প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদনের বরণডালা হ'ল দেহ।

'অঙ্গ আমার অর্ঘ্যের থাল
অরূপ ফুলে'

—অর্ঘ্য, মহুয়া

এইরূপ অরূপ আত্মার কার্যরূপ। দেহের সীমা ঘিরেই আত্মার কার্যের প্রকাশ। রূপ না হলে রূপাতীতের ব্যক্ততা সম্ভব নয়। তাই দেহকে অস্বীকার করা যায় না। অধ্যাত্মপ্রেমেও দেহের অস্বীকৃতি নেই। কিন্তু সে প্রেম দেহভিত্তিক নয়।

বাউলের উৎকর্ষ

সে প্রেমে স্থৈর্যবিহীন অত্যুৎকণ্ঠা, লালসা, উদ্বেগ-যুক্ত সঙ্গলিপ্সা, স্থূল দেহবিলাস নেই। সে প্রেম স্বার্থসাধন-তৎপর নয়, আত্মনির্দিষ্ট পথে তার গতি। তাই সে সঙ্কল্পজ-কামনাহীন। আত্মকর্তৃত্বে তার ক্রিয়া, আত্মায় তার অবস্থিতি। এজন্য ব্যক্তিক চাওয়া পাওয়ার বিড়ম্বনায় সে বিড়ম্বিত নয়। তার গতি লঘু, দৃষ্টি স্বচ্ছ, অবস্থা সহজ। অধ্যাত্ম প্রেমের স্বরূপের মানদণ্ডে বিচার ক'রে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রেমকে আধ্যাত্মিক প্রেম বলে স্বীকার করা যায় না। আধিভৌতিক প্রেম-বর্ণনামূলক বৈষ্ণব কাব্যও তাই আধ্যাত্মিক কাব্য নয়। এই কারণে আধিভৌতিক রচনার উর্ধ্বে অবস্থিত বাউল গানের ভাবগত উৎকর্ষ অবশ্য স্বীকার্য।

সর্বশেষে বাউলের অনুসরণে রচিত যে সমস্ত গান প্রচলিত, তাদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। খাঁটি বাউলগানের সঙ্গে আজকাল পথিক ভিখারির মুখে ও গায়ক ফকিরের কণ্ঠে বাউলগান নামে নানা গান শোনা যায়। তাতে শুধু ভবসংসারের

অসারতা প্রতিপন্নের চেষ্টা ও শমনভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে দার্শনিকতার ভান আছে। সাহিত্য ও দর্শন কোনোদিক থেকেই তার কোনো মূল্য নেই। এগুলি সাধারণত ভিখারী গায়কের অথবা অপটু গ্রাম্য কবির রচনা। এগুলি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চলতি হাটের সস্তা দরে পথে পথে বিকোচ্ছে'। কিন্তু এ ছাড়াও আর এক শ্রেণীর নকল বাউল গান আছে, যার রচয়িতা অশিক্ষিত, অখ্যাত গ্রাম্যজন নয়, পরন্তু শিক্ষিত ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক। বাঙলা সাহিত্য-জগতের একাধিক সুপরিচিত কবি বাউলের অনুসরণে বাউল সঙ্গীত রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। বিহারীলাল প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রকাব্যের তথাকথিত বাউল সঙ্গীত যে এ পর্যায়ের নয়, সেকথা বলা বাহুল্য। কারণ রবীন্দ্ররচনাগুলি বাউলের অনুকরণজাত আদৌ নয়। তিনি 'জাল করতে চেষ্টাও' করেন নি, সে কথা স্পষ্টভাবেই বলেছেন। আমরাও অন্য পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে আলোচনা ও বিচার করেছি।[১] রবীন্দ্রেতর রচনাগুলি স্পষ্টত বাউলগানের বোধানুকূল অনুকরণজাত। সহজ ভাষায়, নকল। বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে এদের স্থান কোথায়, খাঁটি বাউল গানের সঙ্গে সমপর্যায়ে এদের স্থাপন করা চলে কি না, এ প্রশ্ন স্বতই উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এগুলি সম্বন্ধে একটু রূঢ় ভাষাতেই বলেছেন এগুলি অস্পৃশ্য। অপ্রিয় হলেও এ উক্তির সত্যতা স্বীকার্য। কারণ শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে কেন সর্বত্রই উপলব্ধিহীন নকলের মূল্য অকিঞ্চিৎকর। বিশেষত সাহিত্যের ভোজে এ একান্তই অভোগ্য। বাউলের দৃষ্টি, বাউলের বিশ্বাস বাউলের উপলব্ধি নেই, অথচ বাউল গানের বহিরাকৃতির অনুকরণ-প্রয়াস আছে, এর ফলে যে সৃষ্টি তা কখনও উপভোগ্য হতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। রূপের অনুকরণে সুন্দরের বিকাশ হয় না, সহজভাব আন্তরিক উৎকর্ষে, বাহ্যিক

বাউল গানের অনুকরণ

১ দ্রষ্টব্য 'বাউল ও রবীন্দ্রনাথ' পরিচ্ছেদ।

রূপের পরিপাট্যে নয়। কাব্যের কাব্যত্ব, তার মৌলিক উপাদান, তার প্রাণসত্তা দেহে বা আকৃতিতে নেই। সে উপাদান দেহে অভিব্যক্ত হলেও দেহাতীত। তাই দেহের অনুকরণে যে বস্তুর সৃষ্টি, তা অনুকৃত থেকে বহুদূরের জিনিষ। আসলে বাউলগানের রীতি বা ষ্টাইলের সঙ্গে বাউলমনের যোগ অঙ্গাঙ্গী, বচনের সঙ্গে বাচনভঙ্গী একান্তভাবে গ্রথিত। সে মনের অধিকারী না হলে সে রীতিও আয়ত্ত হয় না। নকল বাউলগানগুলি তাই মূল্যহীন। তার মধ্যে বাউলের বিশিষ্টতাও নেই। রচয়িতার বৈশিষ্ট্যেরও অভাব। দুনৌকায় পা দেওয়ার ফলে এ শ্রেণীর সৃষ্টির ভরাডুবি ঘটে। এগুলি কেবল সখের রচনা, যেমন ব্যক্তি, তেমনিভাবে বাউলগানের অনুকরণ-প্রয়াস।

কবি বিহারীলালের বাউলবিংশতি থেকে এখানে একটি গান উদ্ধৃত করি—

'সবই গেছি ভুলে
জাগো হে প্রাণের প্রাণ, দাও মনের ধাঁধা খুলে।
ভিতরে কাতরে প্রাণী সুখী ভেবে অভিমানী
মরণ যে কি বিষাদ যেন তা জানি নে মূলে।
আহা সে পবিত্র পদ পূর্ণানন্দ নিরাপদ
পরম সম্পদ আমার, ত্যজি পূজি নারী কুলে।
করুণ কিরণে কার বিকশিত প্রেম আমার
সৌরভে উন্মত্ত হয়ে কারে দিলেম বিনি মূলে।
স্নেহ ভক্তি ভালোবাসা মেটে না—মেটে না আশা
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত বসি সুধা সিন্ধু কুলে।'

—বাউল বিংশতি, বিহারীলাল

এগুলি বাউলগান নয়, সখের বাউল গান। উভয়ের পার্থক্য অতিপ্রত্যক্ষ।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে অনুকরণ প্রয়াসের যদি এই পরিণতি

হয়, তার মূল্য যদি অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে, তবে অনুসরণ বা স্বীয় বোধানুযায়ী অনুকরণের চেষ্টার এমন প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে এ কথাই বলতে হয় যে, এ জগতে ব্যক্তি-বোধের দুই অবস্থা। এক আত্ম-বোধ, আর এক কেবল অনুগমনরূপ। ব্যক্তির কাছে যতদিন না আত্মবোধ প্রকাশ পায়, ততদিন অন্যের অনুকরণ-চেষ্টাতেই নিজের প্রচার করতে হয়। এই প্রচারের আকর্ষণ ভালোমন্দ বোধের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তির কাছে যা ভালো বলে মনে হয়, তারই অনুকরণে নিজেকে প্রচার করার ইচ্ছা হয়। তাই বিহারীলালও বাউলের অনুকরণ করতে চেষ্টিত হয়েছেন।

সখের বাউল

কিন্তু সত্যের সহজরূপের কাছে অসত্যের অসহজ রূপচাতুরী আপন বৈশিষ্ট্যকে বজায় ক'রে রাখতে সমর্থ হয় না। তাই কালে তার আদর নষ্ট হয়। সত্যরূপেরই সার্বত্রিক সমাদর দেখা দেয়। উভয়ের ব্যবধান স্পষ্ট। সে পার্থক্যকে প্রত্যক্ষ করার জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন নেই। এ পার্থক্য ফুলের সঙ্গে কাগজের ফুলের পার্থক্য। খাঁটির মতো এর 'আহ্বান নেই, শুধু ছলনা আছে।'

নকলের মূল্য

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাউলের প্রকৃত স্থানটি কোথায়, তা বিশদভাবে আলোচিত হ'ল। সমগ্র বাঙলাসাহিত্যে আত্ম-প্রভাবিত, আত্মভাব-প্রকাশক কাব্য মাত্র দুটি, পূর্বার্ধে বাউল এবং পরার্ধে রবীন্দ্রকাব্য। এই দুটি কাব্যেরই অবস্থিতি অধিভূত স্তরের ঊর্ধ্বে। উভয় কাব্যই সমস্তরবর্তী। তবে পার্থক্য উভয়ের কবি-মানসের গতি বা প্রবণতায়। রবীন্দ্রকাব্য সত্যভাবের প্রকাশে আধ্যাত্মিক, বাউলকাব্য নেতিমূলক নিরসনে আধিদৈবিক। রবীন্দ্রকাব্য তাই বিপুল, বহুবৈচিত্র্যময়; বাউলকাব্য স্বল্পপরিসর, বৈচিত্র্যবিহীন, একভাব-প্রধান। বহু শাখাপ্রশাখা সমন্বিত, পত্রপুষ্প-

শোভিত, বিপুলায়তন, বিরাট মহীরুহের মতো রবীন্দ্রকাব্য রেখা-বৈচিত্র্য ও বর্ণ বাহুল্যে সুসমৃদ্ধ। ঊর্ধ্বশীর্ষ রেখ-মূর্তি তাল-বৃক্ষের মতো বাউল কাব্য জটিলতাহীন ঋজু। তার সমুন্নত শীর্ণমূর্তি গগনস্পর্শী। রবীন্দ্রকাব্য বহুতন্ত্রী-বিশিষ্ট বীণা, তার ঝনন রণণে বিশ্ব মুখরিত। বাউলকাব্য একতন্ত্রী একতারা, তার একটি তারে একটি সুর ঝঙ্কৃত। সে সুর অসীমের সুর।

একতারা-হাতে উদাসী বাউল চলেছে গান গেয়ে তার বহু-বাঞ্ছিত তীর্থক্ষেত্রে, অধরার অন্বেষণে। উদাত্তসুরে সে গাইছে—

উপসংহার

'আমি কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যে রে
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।'

কে সে মনের মানুষ, কোথায় তার সন্ধান মেলে, আমরা সংসারী জীব তা জানিনা, জানতে চাইও না, তবু একতারার সাহচর্যে বাউল যখন গায় 'কোথায় পাব তারে', তখন সে সুর আমাদের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ ক'রে প্রাণকে উদাস ক'রে তোলে। আমাদের মন নানা কাজে ব্যস্ত, নানা চিন্তায় বিজড়িত, তবু মনের প্রতি-বন্ধকতা সত্ত্বেও বাউল সুর প্রাণে পশে। বাউলগান প্রাণ টানে। আমাদের ভিতরের 'আমি' গায়ককে বলে 'বন্ধু', বলে 'আত্মীয়'। বাহিরের 'আমি'টা কটাক্ষে তাকায়, ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলে, 'ও কেউ না, পাগোল, বাউল'।

বাউলের কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই। 'আপনা পথের পথিক' আপন পথে যায়, আর গায়—

'হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।'

একতারার সুর সেই একের অভিসারে ছুটে চলে।

সঙ্গীত সংগ্রহ

।১।

অকৈতব মানুষের কথা কইতে লাগে ভয়।
মনে হয় ফল্‌গু নদী নিরবধি যেমন অন্তঃশীলা বয়।
মানুষ সকলেতে কয়, কথা মিথ্যা কিছু নয়,
এই মানুষের প্রলয়েতে তিন মানুষ হয়।
মানুষ স্বয়ং শক্তি জীবের মুক্তি, যুক্তি করে জানতে হয়।
রত্ন বেদীতে নিধি বসে রয়, এ তিন মানুষের কেউ নয়,
পূর্ণিমার চাঁদ ষোলকলা নিগমে উদয়।
ইহার নির্ণয় করে ধর তারে, সে সকলের অগোচর রয়।
ভাণ্ড হইতে এ ব্রহ্মাণ্ড হয়, যুগে আছে পরিচয়,
হলে মরা, যাবে ধরা রসিক মহাশয়।
মদন কয় সে মানুষ বেশে এই স্বদেশে
লাগিয়ে দিশে দেশে রয়।

।২।

অনুরাগ নৈলে কি সাধন হয়
সে তো শুধু মুখের কথা নয়।
তার সাক্ষী আছে চাতক রে
ও সে কোটি সাধনে যায় মরে
চাতক অন্য বারি খায় না রে
থাকে মেঘের জল আশায়।
বনের পশু হনুমান
রাম বিনা তার নাই যে ধিয়ান,
মুদিলেও তার দু নয়ন
অন্যরূপ না ফিরে চায়।

রামদাস মুচির ভক্তিতে
গঙ্গা এল চাম কেটোতে
এমন সাধন করে কত মহতে
কেবল লালন কূলে কূলে বায়।

।৩।

আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে দেখনা রে মন ভেয়ে
দেশ দেশান্তর দৌড়ে এবার মরিস কেন হাঁপিয়ে।
করে অতি আজব ভাক্কা
গঠেছে সাঁই মানুষ-মক্কা
কুদরতি নুর দিয়ে।
ও তার চার দ্বারে নুরের ইমাম মধ্যে সাঁই বসিয়ে।
মানুষ-মক্কা কুদরতি কাজ
উঠেছে রে আজগবি আওয়াজ
সাততলা ভেদিয়ে।
আছে সিং দরজায় দ্বারী একজন নিদ্রাত্যাগী হইয়ে।
দশদুয়ারী মানুষ-মক্কা গুরুপদে ডুবে দেখ গা
ধাক্কা সামলায়ে।
ফকির লালন বলে সে যে গুপ্ত মক্কা
আদি ইমাম সেই মিঞে॥

।৪।

আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা
অতি নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা
কাছে রয়ে ডাকে তারে, উচ্চস্বরে কোন পাগেলা।
ওরে যে যা বোঝে, তাই সে বুঝে থাক রে ভোলা
যথা যার ব্যথা নেহাৎ সেইখানে হাত ডলামলা।
তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা
যে জনা দেখে সে রূপ করিয়ে চুপ রয় নিরালা
ওসে লালন ভিড়ের লোক জানানো হরিবোলা, মুখে হরিবোলা।

।৫।

আপনি রাজা আপনি প্রজা ভবের পারে
বাজিকর পুথলো নাচায় কথা কহায় আপনি তারে জীবদেহে।
সাঁই চলায় ফেরায় সেই প্রকারে।
আপনারে চিনবে যে জন পশবে সে জন ভেদের ঘরে
ছেরাজ সাঁই কয় লালন কি আর বেড়াও ঘুরে।

।৬।

আপনাকে আপনি যে জন জানে
আপন আত্মাকে সে দেখেছে নয়নে
সবে বলে আমি আমি, আমি কে তা কেউ না জানে।
লালন বলে আমার এ আমি সর্বসাধন গুরুর চরণে।
ও মন আপনাকে যে চিনেছে, নিগূঢ় তত্ত্ব সেই পেয়েছে,
সে জন নিগমে বসে আগমে ধরে টানে।
সে তো বসিয়ে আছে হয়ে গোটা সে ঢাকায় বসে
দিল্লীর খবর জানে।

।৭।

আমার আপন ঘর আপনার হয় না।
একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা।
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখ না।
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি,
আমার কোলের ঘোর তো যায় না।

আত্মরূপে কর্তা হরি, মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি ঠিকানা।
আমি আমি কে বলে মন যে জানে তার শরণ লও না।
ফকির লালন বলে মনের ঘোরে
হলাম চোখ থাকিতে কাণা।

।৮।

আমার ডুবলো নয়ন রসের তিমিরে
কমল যে তার দল গুটালো আঁধারের তীরে।
গভীর কালোয় যমুনাতে চলছে লহরী
রসের লহরী।
ও তার জলে ভাসে কাণে আসে।
রসের বাঁশরী
আমি বাইরে ছুটি বাউল হয়ে সকল পাসরি।
ঘর ছাড়িয়ে কেঁদে মরি
ভাসাই কুম্ভ রসের নীরে।

।৯।

আমাদের রসিক নেয়ে
রসিক বিনে নেয় না কারে।
যে জনা প্রেম জানে না চড়তে মানা
ডুবে তরী অল্প ভারে॥

।১০।

আমার ঘরের চাবি পরেরই হাতে
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে।
আপন ঘরে বোঝাই সোনা পরে করে লেনা দেনা
আমি হলেম জন্মকাণা না পাই দেখিতে
রাজী হলে দারোয়ানী দ্বার ছাড়িয়ে দিবেন তিনি
তারে বা কৈ চিনি শুনি বেড়াই কুপথে
এই মানুষে আছে রে মন যারে বলে মানুষ রতন
লালন বলে পেয়ে সে ধন পারলাম না চিনতে।

। ১১ ।

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

লাগি সেই হৃদয় শশী
সদা প্রাণ হয় উদাসী
পেলে মন হত খুসী
দেখতাম নয়ন ভরে।

আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে
নিভাই কেমন করে
মরি হায় হায় হায় রে।

ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
ওরে দেখ না তোরা হৃদয় চিরে।
দিব তার তুলনা কি
যার প্রেমে জগৎ সুখী
হেরিলে জুড়ায় আঁখি
সামান্যে কি দেখতে পায় তারে

তারে যে দেখেছে সেই মজেছে
ছাই দিয়ে সংসারে।
ওসে না জানি কি কুহক জানে
অলক্ষ্যে মন চুরি করে
কুল মান সব গেলো রে
তবু না পেলাম তারে

ও তার বসত কোথায় না জেনে ভাই
গগন কেঁদে মরে।

। ১২ ।

আমি মজেছি মনে
না জানি মন মজল কিসে আনন্দ কি মরণে।
ওরে আমায় এখন ডাকা মিছে
নাই যে হিসাব আগে পিছে
আনন্দে মন নেচে ওঠে তার নূপুর বাজে রাত্রে দিনে।
কই সে সাগর কই এ নদী
তবু চলছে খবর নিরবধি
আজব রঙ্গ দেখবি যদি মিলা নয়ন হৃদয় সনে।+

। ১৩ ।

আমি বুঝতে নারি, ভেবে মরি ঘটিল একি
আমি ডিমে এলেম ডিমে গেলেম, হতে নারলেম পাখী।
যুগে যুগে কত যুগ গেল তুমি ডিমে বসে তা দিতেছ ডিম না ফুটিল,
শুনেছি সাধুর কথা, সময় হলে ডিম ফুটায়ে দেন পক্ষীমাতা।
বল আমার কবে সেদিন হবে যেদিন ফুটবে আঁখি—মায়া ডিমের।
জ্ঞান ভক্তি বিবেক পেয়ে কাঙ্গাল মানুষ হয়ে মায়া ডিমে রয় বদ্ধ হয়ে।
একবার খুলে দাও এ জ্ঞান আঁখি প্রাণ ভরে তোমায় দেখি প্রাণের মাঝে

। ১৪ ।

আমি একদিনও দেখলাম না তারে
আমার আড়শী নগরে এক পড়শী বসত করে
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে।
মনে বাঞ্ছা করি দেখবো তারে আমি কেমনে সেথা যাই রে।
আমি বলব কি পড়শীর কথা, তার নাই হস্ত নাই মাথা নাই স্কন্ধ রে
সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের পর ক্ষণেক ভাসে নীরে।
সে পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
তবে সব যাতন দূরে যেতো
সে আর লালন একখানে রয়, থাকে লক্ষ যোজন ফাঁক রে।

। ১৫ ।

আমি কি সন্ধানে যাই সেখানে
আমার মনের মানুষ যেখানে
অন্ধকারে জ্বলছে বাতি
দিবারাত্র নাই সেখানে। +

। ১৬ ।

আমি আমার করিস রে মন আমি কে তোর তাই চিনলি না।
ও তোর ব্যর্থ হল কর্তাগিরি তবু কেন হার মানলি না।
অহংকারে মত্ত হয়ে ভূতের বোঝা মরলি বয়ে
ওরে হাল ছেড়ে পাল তুললে পরে মুক্ত হবি তাও জানলি না। +

। ১৭ ।

আর খুঁজলে কোথায় পাবি তারে ভজলে মিলে মানুষে
মানুষ রতন মিলবে রে মন মানুষের উপদেশে।
যা কিছু আছে বলতে আপন শতদলে সৎ মানুষের চরণ।
ও তার পাবি দরশন।
মানুষ লীলা সব লীলার সার, লীলা তার কি চমৎকার
রূপে রসে মন মজে না যার সেই তো মানুষ ধরে বসে।
সহজ মানুষ গুরু গোসাঁই সে যে খেলিছে সদাই
রাধেশ্যাম কয় মানুষ ভজ ভাই মানুষে আছে মিশে। +

। ১৮ ।

আসিয়ে কিনিতে সোনা কিনলি কিনা
ওরে কানা রাং তামা-কে।
ভবের মাঝে এসে লাগলো দিশে
ঘুচবে কিসে বল আমাকে

রাং রজ তামা তম সোনার সত্বগুণ যাহাতে
দরদী হবে যে জন কিনবে সে জন
অন্তে কেবা চিনবে তাকে।
না হলে ভাবের ভাবী ভবের হাটে
গোল মিটে কি ভূয়ো জাঁকে।
ক্ষ্যাপাচাঁদ বলে ফাঁকা লাভের তরে
ভাবের ঘরে পড়লি ফাঁকে।

। ১৯ ।

উপরোধে কাজ দেখ রে ভাই ঢেকি গেলার মত।
ওরে যায় না গেলা ওলাগলা কেড়ে হয় সে হত (?)
মনটা যাতে রাজি হয় প্রাণটা তাতে আপনি যায়
পাথর দেখে সোনার মত।
আবার বেগার ঠেলা ঢেকি গেলা ঢাকশালে সে নাইত।
মন যাতে নয় পূজলে কি হয় ফুল দিয়ে শত শত।
যার মনে যা লাগে ভাই করুক করুক তাই
তার লেগে গোল কেনে এত।
লালন বলে লাথিয়ে পাকায়ে সে ফল
হয় কি মিঠে এতো।

। ২০ ।

এ ঘর খানায় আমার কে বিরাজ করে
আমি জনম ভরে তারে একদিনও দেখলাম নারে।
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে, দেখতে পাইনে এ নয়নে
হাতের কাছে যার ভবের হাটবাজার আমি ধরতে গেলে হাতে
পাইনে তারে
সবে বলে প্রাণপাখী শুনে চুপে চুপে থাকি
জল কি হুতাশন, মাটি কি পবন, আমায় কেউ বলে না একটা নির্ণয় করে
আপন ঘরের খবর হয় না, ইচ্ছা করি পরকে চেনা
লালন বলে পর বলতে পরমেশ্বর
সে কেমন রূপ, আমি কি রূপ রে।

। ২১ ।

এ নয়নে তারে না দেখিলে শুধু মুখের কথায় প্রাণ জুড়ায় না।
শুনা কথা সবাই বলে দেখা কথা কেউ বলে না।
বর্তমান রূপ যে দেখেছে, তার মনে কি আঁধার আছে
তারা সদাই থাকে রূপ নেহারে, পলকে পলক ফেরে না।
অনুরাগী জ্যান্তেমরা বেদবেদান্তের করমধারা
যার হয়েছে করম সারা মরার আগে সেই মরেছে। +

। ২২ ।

ওগো দরদী আমার মন কেন উদাসী হতে চায়।
তার ডাক নাহি হাঁক নাহি গো
আপনে আপনে চলে যায়।
ধৈরজ না ধরে অন্তরে মন শিহরে নয়ন পারে
মন নীরব সে রবে সদা বলে আয় গো আয়।
ভাটী সোতে ভাটারি গড়ান
সাগর যেমন সদা টানে নদীর পরাণ
সে টান এতোই প্রবল মনের গরল
অমৃত হইয়ে যায়।
কেমন করে দেয় গো মন্ত্রণা
উড়ায়ে দেয় মনের পাখী, মানা মানে না।
উড়ে যায় বিমানের পানে
শীতল বাতাস লাগে গায়।

। ২৩ ।

ওগো মূলাধার, তুমি আপ্নে কর পার
আমি চাহি না নিস্তার।
তুমিই সাগর আমিই তরী তুমিই খেওয়ার মাঝি
কূল না দিয়ে ডুবাও যদি তাতেই পরাণ রাজি।
ওগো তোমা হইতে কূল কি বড়
ভরম কি আমার।

কূল তুমি হে অকূল গোসাঁই সাগর তবে কে
ওরে তার উপরে লহর গোসাঁই যতই খুসি দে।
আপ্নে যদি ঝুল দিতে চাও
থির চাহি না আর
আপ্নে যাহা হওনা গোসাঁই নাই তাতে মোর মানা
আরের হাতে সৈপো না গো দেই তোমারে জানা।
আপ্নে রাখ, আপ্নে মার
ওগো সারাৎসার।

। ২৪ ।

ও ভোলা মন
ত্যজিয়ে আসল যে ধন কেন রে মন সুদের কারণ টানাটানি।
আসলে ত্যাজ্য করে, সুদকে ধরে বড় মূর্খ সেই তো জানি।
সুদকে ত্যাজ্য কর, আসল ধর, থাকিবে ঠিক মহাজনী।
জান না আসল হতে এ জগতে যত সুদের আমদানি।
তবে কেন আসল ত্যজে, সুদকে ভজে বেড়াও করে পাগলামি।
গোপনে সযতনে আসল ধনে রাখে যে সেই আসল ধনী,
আসলে সুদের কড়ি ডালখিচুড়ি, মিশালে হয় বলে জ্ঞানী।
সাগরেত ফিকিরচাঁদ বলে, আসল পেলে ভবজ্বালা ঘোচে জানি।
আমি সেই আসল ধনে নাহি চিনে করিতে চাই মহাজনী।

। ২৫ ।

ও গুণী কওনা শুনি কোন গুণে মানব হয়েছো
তোমার পিতৃধনের বিনাশ করে রতিমধ্যিখানে হারিয়ে আছো।
তোমার নাই দরজায় আসল তালা
তুমি কোন দ্বারে চাবি হেনেছো।
তোমার রোজার গাঁয়ে তোশিলদারী
কেবল ভাঙ্গা গাঁয়ে মোড়ল সেজেছো।
তোমার মন্দিরেতে নাই যে মাধব
কেবল শাঁখ ফুকে হায় গোল করেছো।

তোমার আসল দ্বারে নাই যে আগল
কেবল ঢেকশালে চাঁদোয়া টানায়েছো।
তাই বলে পদ্মলোচন কেবল ভগ্নদশা হয়ে আছো
তুমি কি ভাণ্ডে কি ব্রহ্মাণ্ডে আছো কোন ভাণ্ডের খবর রেখেছো।+

। ২৬ ।

ও কি সামান্যে তার মর্ম পাওয়া যায়।
ও তার হৃদি কমলে উদয় হলে অজ্ঞান খবর জানা যায়।
দুধে যেমন ননী থাকে, ধরে খায় রাজহংস তাকে
কারো মন যদি চায় সাধু হতে ঐ সে রাজহংস সে হয়।
পাথরেতে অগ্নি থাকে, বাইরে কর‍্যা নাও ঠুকরী ঠুকে
বোকা লালনচাঁদ তাই কয়।

। ২৭ ।

কি আর দেখিস কানা হাতড়ে তোর আঁধার ঘরে
মনের কালি মুছে আলো জ্বাললে পাবি যে তারে
সে যে আলোর ঘরে আলোর ছবি
আলো বিনা তারে না লভি
সে আলোর তেজে তোর কাণা চোখ ফুটে যদি
তাই তারে আলোক নামে ডাকে ঈশান নিরবধি।+

। ২৮ ।

কিছু হয় না সাধন ভজনে অনুরাগ বিনে।
আসমানেতে গাছের গোড়া রে তায় ফল ধরে কলি সনে
কাকের বাসায় হয় কোকিল আরেক ডালে শঙ্খচিল
কোকিলের অঙ্গ কালো ভঙ্গ বাঁকারে গোপীদের মন ভুলে সে স্বর শুনে।
ক্ষেপাচাঁদ বাউল কয় অক্ষরে তার কর্ম নয়, তার মর্ম বুঝতে হয়।
ও তোর দেহের মাঝে পঞ্চ কাঁটা রে কাঁটা উঠবে রে সময় গুণে।

। ২৯ ।

কে বানাল এমন ঘর ধন্য কারিগর।
তার কারিকুরি বলিহারি সে মিস্ত্রীর কোথায় ঘর।
ঘরের মূল তিনটি খুঁটি, ও তার বেশ পরিপাটি
এ ঘর পাঁচ বরণের পাঁচ ধরণের পাঁচ কুঠরী মনোহর।
ঘরের দরজা নয়খান ও তার সকলি প্রমাণ
অসংখ্য জানালা তার কে করে গণন।
এ ঘর আড়ে বিঘে চোদ্দ পোয়া, চোদ্দ ভুবন তার ভিতর।
ঘরের পাঁচিল সপ্তপুর, তার মধ্যে অন্তঃপুর।
সন্ধানী যে যেতে পারে, অন্যের পক্ষে দূর।
সেথা লাগবে ধাঁধা চাক্‌কা চাঁদা প্রবেশ করা কষ্টকর।
এ ঘর বেশ আঁটসাটা ছয়তলা কোঠা
সেথার দিবানিশি মণি জ্বলে, ঘরের কর্তা থাকেন তার ভিতর।
এতো কথা মিথ্যা নয়, ঘরের মাটিতে কথা কয়
ঘরের ভিতর জল আগুনে একত্তরে রয়।
সেথা সাধু চোরে রাক্ষস নরে বিষামৃতে একত্তর।
অনন্ত বসে ভাবছে তাই ঘরের অন্ত কিসে পাই
ঘরে থেকে কর্তার সঙ্গে আলাপ হল নাই।
ও তুই দেশ বিদেশে ছুটে বেড়াস না করে ঘরের খবর।+

। ৩০ ।

কে কথা কয় রে, ও দেখা দেয় না
হাতের কাছে নড়ে চড়ে খুজলে জনম ভোর মেলে না
খুঁজি আমি আশমান জমি আমাকে না চিনি আমি
সে বড় ভূমের ভূমি আমি কোন জন সে কোন জনা।
না জানি বাড়ীর খবর মন চলেছে দিল্লি শহর
কাশিম কয়, ওরে লালন এখনো তোর ভ্রম গেল না।

। ৩১ ।

কোথা আছে রে দীন দরদী সাঁই
চেতন গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর কর ভাই।
চক্ষু আঁধার দেলের ধোঁকায় কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
কি রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই বসে নিগম ঠাঁই।
এখনও না দেখলাম যারে চিনব তারে কেমন করে
ভাগ্যেতে আখেরে তারে দেখতে যদি পাই
সুমজে ভবে সাধন কর, নিকটে ধন পেতে পার
লালন কয় নিজ মোকাম ঢোঁড় বহুদূরে নাই।

। ৩২ ।

কোন সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে
দেখো সে আপনি বাজায়, আপনি মজে সেই রবে।
নামটি নাসরি কালা, সবের শরিক সেই একেলা
আপনি তরং আপনি ভেলা আপনি খাবি ডুবে।
ত্রিজগতে জেরায় রাঙ্গা, তার দেখি ঘর খানি ভাঙ্গা
হায় কি মজার আজব রঙ্গ দেখায় কেমনভাবে।
আপনে চোরা আপন বাড়ী, আপনি সে লয় আপন বেড়ি
লালন বলে এ নাচাড়ি কেনে থাকি চুপচাপে।

। ৩৩ ।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন বেড়ী দিতাম তাহার পায়।
আট কুঠরী নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝলক কাটা
তার উপর আছে সদর কোঠা আয়না মহল তায়।
মন, তুই রইলি খাঁচার আশে,
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে,
কোনদিন খাঁচা পড়বে খসে,
লালন কয় খাঁচা খুলে সে পাখী কোনখানে পালায়।

। ৩৪ ।

খুঁজলে কোথায় পাবি তারে
আছে মনের মানুষ নির্জ্জনেতে সামান্যেতে যায়না ধরা
সে যে রসিক শেখর মনের অগোচর কেমনেতে চিনবি তোরা
ধরে গুরুর শ্রীচরণে নাও মানুষের সন্ধান জেনে
নৈলে ধরতে পারবি কেনে।
শুনেছি তার নাম অধরা।
যে সার বুঝেছে, পেয়েছে মানুষ, অসারে মজে যে সেজন পায় তুষ
প্রাপ্তি হয় না না থাকলে হুঁস, সে মানুষ টলাটল ছাড়া।
মন যদি বাসনা ছেড়ে মানুষ চাঁদের আশায় ফেরে
তবে মানুষ ধরতে পারে, হতে হয় রে জ্যান্তেমরা।
গোসাঁই গুরু চাঁদের বচন রাধাশ্যাম তোরে বলি শোন
মানুষ ধরার এইতো লক্ষণ সাধন হল তোলাপাড়া।+

। ৩৫ ।

গুরু আমার পূর্ব্বের কথা মনে নাই
জানতে এলেম তাই।
পূর্ব্বের কথা মনে হলে ভাসি আমি দুই নয়ন জলে
আর কি আছে কপালে দিবানিশি ভাবি তাই।
নাক থাকতে নিশ্বাস বন্ধ, মুখ থাকতে বাক্য বন্ধ
চোখ থাকতে হলাম অন্ধ মনে মনে ভাবি তাই।+

। ৩৬ ।

চাতকস্বভাব না হলে অমৃত মেঘের বারি কথায় কি মিলে
চাতকের এমনি ধারা তৃষ্ণায় জীবন যাবে রে মারা
তবু অন্য বারি খায় না তারা মেঘের জল বিনে।
মেঘে কত দেয় রে ফাঁকি তবুও চাতক মেঘের ভুখি
এরূপ নিরীখ রাখরে আঁখি সাধক বলে।
মন হয়েছে পবন-গতি, উড়ে বেড়ায় দিবারাতি
অধীন লালন বলে গুরুর প্রতি ও মন রয় না সুহালে।

। ৩৭ ।

চিরদিন জলে ফেলে রগড়াইলে কয়লার ময়লা যায় না ধুলে।
যদি রে কর গুঁড়া, দিয়া নোড়া, রেখে তারে পাথর শিলে,
তবে সে হবে চূর্ণ সে বিবর্ণ যাবে না আর কোনকালে।
ওহে ভাই কয়লা ঘসে অবশেষে ফেল যদি কোন স্থলে,
তবে রে তথায় কয়লা করে ময়লা, আপনার সাধন ফলে।
দীনহীন কাঙ্গাল বলে, ভাগ্যফলে যদিরে সেই জ্ঞান মেলে
তবে রে আগুন লাগায় অঙ্গারের গায়, সকল ময়লা যায় রে জ্বলে।

। ৩৮ ।

ডাকে করুণ স্বরে, পাখীর হল কি ?
একে ঘোর রাতি, মাঝে নদী, দুপারে দুপাখী।
একটি পাখী ডেকে বলে, ভেসে যায় সে নয়ন জলে
আমি তোমা বিনে এ ঘোর রাতে কেমনে প্রাণ রাখি।
আর এক পাখী বলে তারে বিনাইয়ে উচ্চস্বরে
হায়রে এখনও যে নিশি বাকি, চেয়ে দেখ সখী।
তুমি যদি উড় এখন, আমায় পাবেনা আর যাবে জীবন,
তাই বলি নিশি পোহাইলে দুয়ে হবে দেখাদেখি।
কাঙ্গাল কেঁদে বলে আবার কবে নিশি প্রভাত হবে আমার
গিয়ে নদীর পারে মিলবে তবে আত্মা চকাচকি।

। ৩৯ ।

তারে তুমি ধরবা কেমন করে
সে তো বেদবিধির উপরে বসে আছে সপ্ততালার পরে।
মানুষ হস্ত নাই ধরিতে পারে নয়ন নাই দেখিতে পারে মরি হেরে
চরণ নাই চলিতে পারে মানুষ যথায় মনে করে।
বড় নিগম ঘরে আছে সাঁই সেথায় চন্দ্রসূর্যের গতি নাই
মানুষ আপন ভাতে আলো করি আছে রসিকের যা করা করণ
প্রাণ থাকিতে জীয়ন্তে মরণ মরি হায় হায় হায় রে
গোসাঁই চণ্ডী বলে রসিক হলে এবার রসে ডুবে মরে।

। ৪০ ।

তীর্থে গিয়ে কি ফল পাবি মন
যদি তীর্থে যাবে আগে তবে কর রে তার আয়োজন।
মা তোর ঘুমায়ে ঘরে, ওরে চিনলি না তারে
সে না জাগিলে তীর্থে বল কি ফল ধরে।

তীর্থে যাবে যদি যথাবিধি মাকে কর রে চেতন।
মা থাকলে ঘুমায়ে লোকে তীর্থে গিয়ে
অনর্থ কিনিয়ে আনে অর্থ দিয়ে।

জাগলে সে জননী কুলকুণ্ডলিনী তীর্থে কিবা প্রয়োজন।
কাঙ্গাল বলে কাতরে মা যে আপন ঘরে ঘুমায়ে আছে মূলাধারে।
তিনি জাগলে পরে আপন ঘরে সব তীর্থ হয় দরশন।

। ৪১ ।

দেখ ভাই কি কারখানা গুণীপনা আজব গাছেতে
করে একের আশ্রয়, গাছ খাড়া রয়, দুই মত ফল স্বাদেতে।
তিনটি মূল গাছের গোড়ায়, চার রসেতে রসাল সে পঞ্চবিধ তায়।
আবার ছয়টি স্বভাব এ কেমন ভাব,
সাত মত সাত ছালেতে (গাছটি বেড়া)।
আটশাখা প্রবল অতিশয়, গাছের গোড়ায় থরে থরে
নয়টি কোটর হয়,

দশটি পাতা গাছে আছে
গাছটি পারে চলিতে পাতার জোরে।
ফিকিরচাঁদ দেখে তামাসা, এত বড় গাছে কেবল
দুই পাখীর বাসা
থাকে একটি পাখী উপবাসী, চায় তারে মন দেখিতে। সকল ছেড়ে।

।৪২।

নয়ন আমি মেলুম না
যদি না দেখি তায় প্রথম চাওনে।
তোরা গন্ধে আমায় বল বলরে শ্রবণে
তোরা বলগো প্রাণে বল শ্রবণে
তোর বন্ধু এসেছে পূরব গগনে
কমল মেলে কি আঁখি
তার সঙ্গী না দেখি
তারে অরুণ এসে দিলে দোলা রাতের শয়নে
নয়ন আমি মেলুম না
যদি না দেখি তায় প্রথম চাওনে।

। ৪৩ ।

নয়ন যাচা যে জন তারে আনিস না ঘরে
পরাণ যাচা রতন তারে ল'গো ল' বরে।
(আমি) দুয়ার খুলি সেই জনারে
(যারে) চোখে না যায় দেখা
(আমি) কতই কি পাই সবই হারাই
তবে গো না হয় শিখা
(আমার) যতই বান্ধন, ততই কান্দন
এই কি কপালে লিখা।
যাওয়ার যেরে ছাইড়া দেরে রাখিস না ধরে।
বাইরে ঘরে যে জন ভরে তারে ল' যাইচা
বসতে তারে আসন দে রে সকল ধন বেইচা।

। ৪৪ ।

মন আমার আজ পড়লি ফেরে
দিন দিন পৈতৃক ধন নিল চোরে
মায়ামদ খেয়ে মনা, দিবানিশি ঝোঁক ছুটে না।
পাঁচ বাড়ীর উল হল না, কে কি করে।

ঘরের চোরে ঘর মারে মন, যায় না ঘুম জানবি কখন
একবার দিলে নয়ন আপন ঘরে।
বেপার করতে এসেছিলি আসলে বিনাশ হলি
লালন হুজুরে গেলি বলবি কিরে।

। ৪৫ ।

মনরে তুই বিষম কানা গেলো জানা সুধা ফেলে গরল খেলি
হলি ইত নষ্ট তত ভ্রষ্ট এ কুল ও কুল সব খোয়ালি
পেয়ে ঐ পরশমনি রত্নখনি যতন করে না রাখিলি
কী বলে সোনা ফেলে অবহেলে আঁচলে কাঁচ বেঁধে নিলি।
নিয়ে পরিবার যত বুদ্ধিতে বিষয়েতে মত্ত হলি
ভজলি না পরামার্থ, পরমতত্ত্ব, তুচ্ছ প্রেমে মজে গেলি।
এখনো আছে উপায় বলি তোমায় থেকো না হে অবহেলি।
ভাবো না দিবানিশি ঘরে বসে মনোমাঝে বনমালা।
গৌরের এই ভাবনা পাছে কানা বিষয় বনে করে কেলি।
সাধের মিনতি যত হবে হত রবে ভূমে সকল ভুলি॥

। ৪৬ ।

মনের মানুষ অটলের ঘরে খুঁজে নাও তারে।
নির্গুণেতে আছে মানুষ যোগেতে বারাম খেলে।
শুদ্ধ, শান্ত, রসিক হলে তবে অধর মানুষ মেলে
রূপ নেহারে গোল করিলে এসে মানুষ যায় ফিরে
কতজন পার হবে বলে বসে আছে নদীর কূলে
হঠাৎ করে নামতে গেলে ধরে খায় কাম কুম্ভীরে।
গোসাই নয়ন চাঁদের উক্তি ভাব রে মন এই প্রকৃতি
তবে হবে মোক্ষপ্রাপ্তি ওবে চণ্ডী কই তোরে।

। ৪৭ ।

মলে ঈশ্বর প্রাপ্ত হবো কেনে বলে
সেই যে কথার পাই না বিচার কারো কাছে শুধালে।
জীবের এই শরীরে ঈশ্বর অংশ বলি কারে
লালন বলে চেনো তারে
মরার ফল তাজায় ফলে।

। ৪৮ ।

যত সব কাণার হাট বাজার
পণ্ডিত কাণা অহংকারে সাধু কাণা অভিচারে
কাণায় কাণায় যুক্তি করে, হতে চায়রে ভবের পার।
কেউ বা হয়ে দিনে কাণা পরের দোষে দিচ্ছে হানা
রাতকানা কেউ শুয়ে শুয়ে ঘুমের ঘোরে দেয় বাহার
কানা বলে ওরে কানা, আমার সাথে চলে আয় না।
আচ্ছা মরি বাবুয়ানা তোর পথে কি আছে সার॥+

। ৪৯ ।

যার তরে প্রাণ কেঁদেছে সে যে তোর হৃদয়ে আছে
বাইরে থেকে ডাকিস কাকে পাবি না দেখা।খুঁজবি মিছে।
যতই কাঁদো, যতই ডাকো, কভু দেখা পাবে নাকো
নাম ধরে ডাকতে শেখো আশার স্বপন মিলবে পাছে।
কি নাম ধরে কোথায় থাকে, সঙ্গ ছাড়া নয় তিলেকে
চিনবি যদি প্রাণবধুকে মোহের অঞ্জন ফেলো মুছে।
নাম ধাম না জানলে পরে কেমন করে চিনবি তারে
সাধ যদি থাকে অন্তরে ঠিকানা জান সাধুর কাছে।
রঙ্গরসে হয়ে মগন অধর ধরা যায় কি কখন
দাস রাধাশ্যাম তোরে বলি শোন গোসাই গুরুচাঁদ কহিছে।+

। ৫০ ।

যার নাম আলেখ মানুষ আলেখে রয়
শুদ্ধ প্রেম রসিক বিনে কে তারে পায়
রস রতি অনুসারে নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে
রতিতে মতি ঝরে মূল খণ্ড হয়।
জানলে আপনার জন্মের বিচার সব জানা যায়।
আপনার জন্মলতা জানগে তার মূলটি কোথা
লালন কয় হবে শেষে সাঁই পরিচয়।

। ৫১ ।

যে পথে সাঁই চলে ফেরে, তার অন্বেষণ কে করে।
বিষম কাল নাগিনীর ভয়
যদি কেউ আজগুবি যায়,
অমনি ওঠে ছোঁ মেরে।
পলক বাড়ে বিষ ধ্যায়া যায়
ওঠে ব্রহ্ম অন্তরে।
সেই তো অধর ধরা
ধরিতে চায় বর যারা
চৈতন্য গুণীন তারা, গুণ শেখো তাদের ধরে।
সামান্য কি যেতে পারে সেই কুপাকের ভিতরে।
যে জানে উল্টামন্ত্র কাটিয়া মোহতন্ত্র
গুরুরূপ ধ্যান কর্যা বিষ ধর্যা ভক্ষণ করে,
করম নিধি সাঁই দরদী দরশন দিবেন যারে।
ভবপারে জন্মাবধি সে পথে না যায় যদি
হবে না তার সাধন সিদ্ধি তাই দেখে তার মন ঝরে।
লালন বলে যা করে সাঁই
থাকতে হবে সেই পথ ধরে।

। ৫২ ।

রে নিঠুর গরজী তুই মানস মুকুল ভাজবি আগুনে
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে।
দেখনা আমার পরম গুরু সাঁই
সে যে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল তার তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড তাই ভরসা দণ্ড এর আছে কোন উপায়
রে গরজী।
কয় যে মদন শোন নিবেদন
দিসনে বেদন সেই গুরুর মনে
সহজ ধারা আপন হারা তার বাণী শুনে
রে গরজী।

। ৫৩ ।

শূন্য ভরে একটি কমল আছে কি সুন্দর
নাই তার জলে গোড়া, আকাশ জোড়া সমানভাবে নিরন্তর।
কমলের সহস্রেক দল, যাতে বিরাজ করে সোনার মানিক কিবা
সে উজ্জ্বল।
তারে যে জেনেছে, যেই পেয়েছে সেই হয়েছে দিগম্বর।
কমলের ডাঁটাতে কাঁটা, আবার ছয়টি সাপে জড়িয়ে ধরে
করেছে লেঠা।
কেবল পায় রে দেখা যারা বোকা, সাপের ফণা ভয়ঙ্কর।
ফিকিরচাঁদ ফকিরে বলে, সেই সাপকে ধরে বশ করেছে
যেজন কৌশলে
কেবল সেই পেয়েছে নিজের কাছে সোনার মানিক মনোহর।

। ৫৪ ।

সর্বদাই চেতনে থাকরে মন
ও মন অচেতনে ঘুমাইলে হারা হবি 'পিতৃধন'।
সত্ত্ব রজ তম গুণে মত্ত রয়েছো কেনে
আর কি হবে তোর দেশ বিদেশে ভাবিল না মনে।
মন যদি না মুড়াইলি কেশ মুড়াইলি অকারণ।

গোটা ছয় হেমো বাঘে তারা রয়েছে জেগে
নয় দ্বারে নয় জনা আছে, আমি পালাই কোন বাগে।
আগে অধ ঊর্ধ্ব কর গো শুদ্ধ তবে পাবি গুরুর দরশন।
গোসাঁই রাধাশ্যাম ভণে, নৈলে অপার ভবনদী তুই তরবি
কেমনে।+

। ৫৫ ।

সহজ প্রেম ঘটলো না হায় সেই মানুষেতে
মানুষ কাজে হত, কর্মে রত হলো ভবেতে
কত কাজে কামান যাচ্ছে, দাওর যাচ্ছে মরে শতে শতে
আছে আট কুঠুরী নয় দরজা মণি কোঠাতে
তুই আঁধার ঘরে রইলি বসে তোর চাবি রইল গুরুর হাতে
সহজ প্রেম ঘটল না হায় সেই মানুষেতে।+

। ৫৬ ।

সহজ সেই রাগের মানুষ নির্বিকার
অনুরাগে মন মজেছে যার
জ্যান্তেমরা হয় অনুরাগী
ও তার জেতের বিচার আচমন আচার বেদ বিধিত্যাগী।
ভব পথের সম্বল ছেঁড়া কম্বল আর লয়েছে হাতে ভাঁড়।
সে যে লাভে হেসে হয় না আটখানা
আর অলাভে বিষাদের বশে বসে ভাবে না।
ও তার অনাদরে কি সমাদরে সমভাবে নয় বেজার।
গুরুবাক্য আত্ম সম যার নিরুপাধি ভবনদী হেলায় হবি পার।
ওরে স্বভাবের ভাবেতে সদা স্বরূপেতে রূপ নেহার।
কাঙ্গাল ক্ষেপাচাঁদের এই বাণী
এমনিধারা হলে ধারা রাগী তায় গণি।
নৈলে লোক দেখানে বেশভূষণে ফায়দা কিছু নেই গো আর।+

। ৫৭ ।

সাঁইজীর লীলা বুঝবি ক্ষেপা কেমন করে
লীলাতে নাইরে সীমা কোন সময়ে কোন রূপ ধরে।

গোসাঁই গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়, গর্তে গেলে কূপজল হয়
গোঁসাঁই এমনি করে ভিন্ন জনায় ভিন্ন বেশে বিচরে।
গোসাঁই আপনার ঘরে আপনি ঘুরি সদা করে রস চুরি
জীবের ঘরে ঘরে।
গোসাঁই আপনি করে ম্যাজেষ্টারী আপন পায়ে পরল বেড়ি
ফকির লালন বলে বুঝতে পারলে মরণ নাহি তারে ধরে।

। ৫৮ ।

সে প্রেম করতে গেলে মরতে হয়
আত্ম সুখী মিছে সে প্রেমের আশয়।
যার আমি মরেছে, তার সাধন হয়েছে
কোটি জন্মের পুণ্যের ফল তারা উদয় হয়েছে
যে প্রাণ করে পণ পরে প্রেম রতন
তার থাকে না যমের ভয়।+

। ৫৯ ।

হাওয়ায় আসা হাওয়ায় যাওয়া হাওয়ার খবর কেউ করলে না।
বার মাসের এই কারখানা মনের মানুষ কেউ চিনলে না
ফকিরচাঁদ দরবেশে বলে হাওয়া ধরা গেলো নারে
যদি কেহ ধরতে পারে আপনারি শক্তি জোরে।+

। ৬০ ।

আমাব আজব অতিথি, আমার আজব দুয়ারে
মারে আজবতর ঘা।
(তার) নাইরে সময় নাই অসময়, (তোবা তারে)
ঠেলতে পারি না।
(যখন) পাতিয়া সেইজ, জ্বালাইয়া দীপ
সারা রাতি জাগি
তখন মোরে দেয়না গো দেখা
আমি জাগি যার লাগি।

উঠাই না সেইজ, নিবাই না দীপ
যখন গো সখী
(তখন) মোর ঘরেতে আসন মাংগে
আমার আজব অতিথি।
তবো তারে কইতে গো নারি যারে ফিরা
যা আমি দুয়ার খুলব না, আমি উঠব না।
দশের সাথে সুখে গো মাতে আমি যখন গো থাকি
তখন অতিথি মোর নয়ন জলে যায় গো ডাকি।
সে ডাক শুনি বুঝি লো সখী আমার
সকল সুখ ফাঁকি।
দুখের চোটে বুক ফাটে, আমার অবশ পরাণ
তখন দেখি মোর অতিথি উজল নয়ান
সেই নয়নে দেখি বুঝি গো সখী
আমার সকল দুখ ফাঁকি।
তবো আমি কইতে গো নারি
তোরে চিনলাম না॥
জনম জনম মহল কাটাইলাম সখী
হরেক বারে দিলে গো দেখা, হরেক লীলা
তবো মদন কইতে গো নারে তোরে চেনে না॥*

। ৬১ ।

নয়ন দেখে গায়ে ঠেকে ধুলা আর মাটি
প্রাণ রসনায় দেখরে চাইখা রসের সাঁই খাঁটি।
চোখে ধুলা আর মাটি, প্রাণে রসের সাঁই খাঁটি।
রূপে রসের ফুল ফুইটা যায় পরাণ সুতা কৈ?
বাইরে বাজে সাঁইয়ের বাঁশী
(আমি) শুইনা উদাস হই।

ওরে আন্ধার রাইতে বাজে বাঁশি
আমি লাজে পথ হাঁটি
বাজে বাঁশি প্রাণ উদাসী আমি
হাঁটি আর হাঁটি।
আমি হাঁটি দূর আর দূর,
তবে শুনি সমান সুর।
কোনখানে তুই যাবি পাগল সবই সাঁইয়ের পুর।
যেই সমুদ্র, সেই দরিয়া, সেই ঘাটের মাটি ॥*

। ৬২ ।

রসের সাগর ডুব দিতে যে বড়ই ডর লাগে।
আমার কাঁচা ঘটে রসের ভরা বড়ই ডর লাগে।
আগুন দিয়া পোড়াও ঘট কাঁচা
নীচে আগুন উচে আগুন হউক মিছা ঘট সাঁচা।
বাহির ভিতর নিত্য রসের আশ।
আগুন মাঝে পোড় রে বান্দা
খাক্ হয়ে আগে ॥

\+ নিজস্ব সংগ্রহ
রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত। রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে।

মূল সঙ্গীতসংগ্রহ থেকে নির্বাচিত ৬২টি গান সঙ্কলিত হ'ল। এগুলি আলোচনায় উদ্ধৃত ও ব্যবহৃত।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

অথর্ববেদ

ঈশোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ, ছান্দোগ্যোপনিষৎ, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, মুণ্ডকোপনিষৎ

মহাভারত : শান্তিপর্ব

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা

সনৎ সুজাতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্র

উজ্জ্বল নীলমণি

চর্যাচর্য বিনিশ্চয়

বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্তপদাবলী

কবীর—ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম

বাউল বিংশতি—বিহারীলাল

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন

ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—ক্ষিতিমোহন সেন

উপনিষদের আলো—ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার

রবীন্দ্র-রচনা :

কাব্য—কল্পনা, ক্ষণিকা, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, মহুয়া, বিচিত্রিতা, স্ফুলিঙ্গ, প্রান্তিক, সেঁজুতি, আকাশ প্রদীপ, সানাই, আরোগ্য, শেষলেখা

নাটক—প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তধারা, রাজা

প্রবন্ধ—লোক সাহিত্য, সহিত্যের পথে, ধর্ম, আত্মপরিচয়, মানুষের ধর্ম, শান্তিনিকেতন, কালান্তর, জীবনস্মৃতি, পঞ্চভূত, বুদ্ধদেব, ভারতবর্ষের ইতিহাস

History of Bengal—Dacca University.

Indian Philosophy—Dr. S. Radha Krishnan.

Philosophy of Rabindranath—Dr. S. Radha Krishnan.

Works of L. Tolstoy.

Works of G. Bernard Shaw.